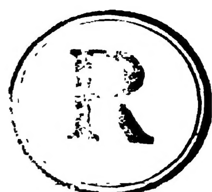


চিত্তরঞ্জন ঘোষ

বিভূতিভূষণ



বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী

বাবা ও মাকে

প্রথম প্রকাশ
২৮ শে ভাদ্র, ১৩৬৬
(বিভূতিভূষণ-জন্মদিবস)

প্রকাশক :
শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
২০, গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৫

পরিবেশক :
মিত্রালয়
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মুদ্রক :
শ্রীজ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়
পি, এম, বাগচী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
৩৮ এ মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
পূর্ণেন্দু পত্রী

দাম : পাঁচ টাকা

সূচী

প্রথম অধ্যায়

রবির আলোকে

॥ এক ॥

'রবীন্দ্রনাথের দান' ॥

বাংলা-সাহিত্যে বিভূতিভূষণের আবির্ভাব 'প্রবাসী' ও 'বিচিত্রা' পত্রিকার মাধ্যমে। উভয় পত্রিকাই রবীন্দ্রভক্ত। 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকালের সুহৃদ, এবং তাঁর আমলে উক্ত পত্রিকার প্রায় প্রতিটি সংখ্যার প্রথম রচনা থাকত রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত। 'বিচিত্রা'-সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও রবীন্দ্রভক্ত; তাঁর কাগজ রবীন্দ্র-জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করত। এই কাগজ দুটির সঙ্গেই যোগাযোগ ঘটেছিল বিভূতিভূষণের। বিভূতিভূষণও মনেপ্রাণে রবীন্দ্রানুসারী—সঠিক যায়গাতেই এসে পৌঁছেছিলেন তিনি।

বিভূতিভূষণের সমসাময়িক কবি-সাহিত্যিকদের অনেকে যখন সচেতন-ভাবে রবীন্দ্র-বিরুদ্ধ বিদ্রোহ সুরু করছেন, তখন বিভূতিভূষণ সচেতনভাবেই রবীন্দ্রানুরাগী। তাঁর মনোধর্ম রবীন্দ্র-গোত্রের—এ সংবাদ তিনি মনের গভীরে জানতেন। তাই রবীন্দ্রনাথকে সেলাম জানিয়ে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে বিভূতিভূষণ কলম ধরেছিলেন। তাঁর কলমকে নিজের মনোধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়নি। প্রথম উপন্যাসেই তাঁর চরম সিদ্ধির এটি অন্যতম কারণ। তাঁর সমসাময়িকদের অনেকে, যাঁরা মনের দিক দিয়ে ছিলেন রবীন্দ্র-গোত্রীয়, রোমান্টিক বাসনা-কল্পনা ছিল যাঁদের প্রতিভার প্রাণস্রোত, তাঁরাও রবীন্দ্র-প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তাঁরা অনেকে তখন জানতেন না যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অর্থ অনেকখানি নিজের বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণ। এই আত্মদ্বন্দ্বে তাঁদের অনেকখানি

সময় ও শ্রমের অপচয় ঘটেছিল, সিদ্ধি হয়েছিল বিঘ্নিত ও বিলম্বিত। তাঁদের নূতন ধারা প্রবর্তনের উৎসাহ ও প্রয়াস নিশ্চয়ই উল্লেখ্য, কিন্তু তাঁদের তাৎকালিক সিদ্ধি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামান্য। অন্য দিকে, বিভূতিভূষণ পূর্বসূরীর প্রবর্তিত ধারায় চলমান, আত্মদ্বন্দ্ব তাঁর মধ্যে অনাগত, প্রথম গ্রন্থই তাঁর সিদ্ধির চূড়ান্ত। 'পথের পাঁচালী'-'অপরাজিত' উত্তর-বিভূতিভূষণ কর্তৃক অনতিক্রান্ত। অন্যদের ক্ষেত্রে বিপরীত কথাই প্রায়শ সত্য; তাঁদের চূড়ান্ত সিদ্ধি ছিল উত্তরকালে অপেক্ষমান।

এঁদের রবীন্দ্রসাধনা ছিল রাবণের পথে—শত্রুভাবে। বিভূতিভূষণের রবীন্দ্রসাধনা মিত্রভাবে।

রবীন্দ্রনাথ কোথায় বড়, এবং কেন তাঁকে ভাল লাগে, এই আলোচনা বিভূতিভূষণ করেছিলেন একটি প্রবন্ধে। তাঁর সাহিত্য-জীবনের গোড়াতেই এটি লিখিত। 'বিচিত্রা'য় 'পথের পাঁচালী' সমাপ্ত হয় ১৩৩৬ সনের আশ্বিনে। আর ১৩৩৮-এর আশ্বিনে 'বিচিত্রায়' প্রবন্ধটি প্রকাশিত। প্রবন্ধটির নাম—'রবীন্দ্রনাথের দান'। এটি প্রায়-অজ্ঞাত একটি রচনা।* দুটি কারণে এই বিস্মৃত রচনাটি বিশেষ উল্লেখ্য। প্রথমত, ঐ সময়ের বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচার এতে আছে। তাতে রবীন্দ্রনাথের কোন বৈশিষ্ট্যগুলি বিভূতিভূষণের মনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত, ঐ সূত্র অবলম্বন করে রবীন্দ্রমানস ও বিভূতিমানসের আত্মীয়তা কোথায় তারও কিছুটা আভাস পাওয়া সম্ভব।

তাঁর কালের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ঐ সময়েই তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতেন। ঐ প্রবন্ধের এক যায়গায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিভূতিভূষণ বলেছেন, 'এ যুগের বাংলার কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রবন্ধলেখক —তাঁর কাছে সবারই ঋণের বোঝা বিপুল, বর্তমান চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত

---

* প্রবন্ধটি খুব সম্ভবত কোন গ্রন্থে স্থান পায়নি। বিভূতিভূষণের গ্রন্থের স্বত্বাধিকারীর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি।

করেচেন তিনি, রূপ দিয়েচেন তিনি—বিশ্লেষণ করে দেখলে সকলেরই চিন্তার উপর রবীন্দ্রনাথের এই প্রভাব ধরা পড়বেই।' বিভূতিভূষণের এই ঋণ কতটা, তার পরোক্ষ ইঙ্গিত এই প্রবন্ধটিতে পাওয়া যাবে। রচনাটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় আগে নিয়ে নেওয়া যাক।

প্রবন্ধটির প্রথম বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথ কোন ইংরেজ বা বিদেশী লেখকের মত ঠিক-ঠিক নন। বাংলার কোন অমুক বলা চলে না তাঁকে।

দ্বিতীয় বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনা সম্পর্কে। বিভূতিভূষণের ভাষাতেই এই যায়গাটা তুলে দিচ্ছি: 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন নানাভাবে। একটা কথাই এখানে বলি। আমার হাতের কাছে একখানা বাংলা উপন্যাস রয়েছে, নাম 'বিজয়বল্লভ' (১৮৮০)।...উপাখ্যানভাগ অবশ্য কাদম্বরীর অনুকরণে রচিত, প্রকৃতি-বর্ণনার মধ্যে পাই decadent যুগের সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণে আড়ষ্ট ও মামুলী ধরণের বাঁধিগৎ। পূর্ণিমার থেকে কোকিলের কুহু পর্যন্ত তাতে সবই আছে, নেই কেবল প্রাণ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতিবর্ণনাও সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব মুক্ত নয়, কিন্তু সর্বপ্রথমে রবীন্দ্রনাথেরই মধ্যে পাই প্রকৃতির বিপুলতা ও রহস্যকে। অনাড়ম্বর ও বাহুল্যবর্জিত বলেই তা প্রাণবন্ত; অসাধারণ চক্ষুষ্মান প্রতিভা সেখানে কেতাবী বর্ণনা-পদ্ধতির মোহপাশ কাটিয়ে দিয়ে নিজের চোখ ও মনকে বড় বলে মেনেচে; সে দর্শনও যেমন নিখুঁত, তেমনি convincing—পদ্মাচরের বিপুল প্রসারের সঙ্গে, পুষ্পিত কাশবনের সৌন্দর্যের সঙ্গে মন সেখানে একদিকে যেমন এক হয়ে মিশে যায়, অন্যদিকে তেমনি নতুন শক্তির উৎসমুখের সন্ধান পেয়ে নতুন পথে দিগ্বিজয়ে বার হবার অদম্য স্ফূর্তিকে লাভ করে। ..তাঁর নব দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যেক জিনিষটি নতুন করে দেখেচে, বিশ্ব মানবের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যোগসূত্রকে আবিষ্কার করেচে,—দৃষ্টির সঙ্গেই নবসৃষ্টির সূচনা হয়েচে, এমন একটি জীবন্ত সদাজাগ্রত মনের পরিচয় আমরা পাই পদ্মাবুকের বজরার কামরায় যা নিদ্রিত হয়ে পড়েনি—নির্জন

রাত্রে রহস্যময়ী প্রকৃতি কখন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন, কখন তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি দেখা হবে—তারই আশায় বিনিদ্র রজনী যাপন করেচে।'

প্রবন্ধটির তৃতীয় বক্তব্য ঐ 'নতুন শক্তির উৎসমুখের সন্ধান পেয়ে নতুন পথে' যাত্রা সম্পর্কে। বিভূতিভূষণ বলছেন, 'জীবনের ও জগতের' ব্যাপারে এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পাই সর্বপ্রথম। ...তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মূলে আছে যে প্রগাঢ় অনুভূতি, তা সাধারণ মনের ব্যাপার নয়, চেতনা ও অনুভূতির সে স্তর সাধারণের দুরধিগম্য—তাই তাঁর কাছে আমরা যে লোকের সন্ধান পাই, আমাদের দৈনন্দিন তুচ্ছ অনুভূতি পরম্পরার বহু ঊর্ধ্বে সে এক অপরূপ আনন্দলোক —তাঁকে পথপ্রদর্শক না পেলে সেটা আমাদের নিকট অপরিজ্ঞাতই রয়ে যেতো চিরদিন।'

চতুর্থ বক্তব্য: রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাদেশিক সাহিত্যকে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করে দিয়েছেন। 'আমাদের সাহিত্যের যে আদর্শ ছিল অত্যন্ত খর্ব, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গত পঞ্চাশ বৎসরের সাধনায় তার ষ্ট্যাণ্ডার্ড এত উঁচু করে দিয়েচেন—সাধারণ গতিতে চলতে চলতে হয়তো দেড়শো বছরেও তা ঘটত কিনা সন্দেহ।'

পঞ্চম বক্তব্য: রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভা। 'রবীন্দ্রনাথের দানের তুলনা নেই, জীবনে এমন কোন দিকও নেই, যেদিকে তাঁর দৃষ্টি পড়েনি, যার সম্বন্ধে তিনি কিছু না কিছু নতুন কথা না শুনিয়েছেন, তা শরৎ-কালীন দুপুর সম্বন্ধেই হোক বা নাম উচ্চারণ করবার পদ্ধতি নিয়েই হোক।'

এর মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বক্তব্যটিই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই দুটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণ সগোত্র। ঐ দুটি দিকে বিভূতিভূষণের মানসিক আগ্রহকে নিঃসন্দেহে পরিপুষ্ট করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বিভূতিভূষণও তাঁর সদাজাগ্রত মন নিয়ে বিশ্বমানবের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যোগসূত্রকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। আর তিনিও সাধারণের

দুরধিগম্য চেতনা-স্তরে গিয়ে প্রকৃতি-আবরণের অন্তরালে নতুন শক্তির উৎসমুখের সন্ধানী।

প্রকৃতিরাজ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অব্যবহিত অগ্রপথিক ও পথপ্রদর্শক। তাঁর সমগ্র প্রকৃতিচেতনাতেই তার স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে। কেবল দুটি সামান্য ব্যতিক্রম উল্লেখ করা সম্ভব যেখানে বিভূতিভূষণ ঈষৎ স্বতন্ত্র। বিভূতিভূষণ স্নিগ্ধ প্রকৃতির উপাসক। রুদ্র সব কিছুর দিক থেকে—প্রকৃতির দিক থেকেও—তিনি তাঁর দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছেন। অবশ্য এ কথা ঠিক, রোমান্টিক শিল্পীদের প্রকৃতিচেতনায় নিষ্ঠুর প্রকৃতির অনুপস্থিতি স্বাভাবিক, কারণ যে প্রকৃতির গভীর প্রেমে তারা অবলুপ্তপ্রায়, তার নিষ্ঠুরতায় অন্ধ না থাকাটাই অসম্ভব। * কিন্তু তা সত্বেও প্রকৃতির রুদ্র সুরে বা শক্তির প্রবলতায় মুগ্ধ হওয়ার মুহূর্ত পাশ্চাত্য রোমান্টিক কবিদের কাব্যে একেবারে অনুপস্থিত নয়। সে মুহূর্ত রবীন্দ্রনাথেও আছে। সেগুলির সংখ্যা তাঁদের স্নিগ্ধ মুহূর্তের তুলনায় কম হলেও তীব্র অনুভূতির আবেগেই উপস্থিত। বিভূতিভূষণে তা নয়। তিনি স্নিগ্ধ প্রকৃতির বেদীতলে একেশ্বরবাদী।

দ্বিতীয়ত, গ্রাম-বাংলার অবহেলিত তুচ্ছ প্রকৃতি-বিষয়ের এত বড় রসিক আর নেই। গ্রামদেশের গাছ পালা, রৌদ্রবৃষ্টি, আকাশ-বাতাস থেকে খানা-ডোবা পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছেন, এবং তাকে খুঁটিয়ে উপস্থিত করেছেন। গ্রামজীবনের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা রবীন্দ্রনাথের ছিল না। তাছাড়া তুচ্ছ প্রকৃতি-বিষয়ের প্রতি তাঁর ঝোঁক কম ছিল। শেষ জীবনে এ ঝোঁক তাঁর কিছুটা এসেছিল —এবং হয়তো সেটা সচেতনভাবেই। কিন্তু তাঁর মনের এমন

* ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রসঙ্গে হাক্‌স্‌লির উক্তি স্মরণীয়: 'A few weeks in Malaya or Borneo would have undeceived him. Wandering in hothouse darkness of the jungle, he would not have felt so serenely certain of those "Presence of Nature", those 'souls of lonely places", which he was in the habit of worshipping on the shore windermere and the Rydal.'

একটা বিশেষ ধর্ম ছিল যার ফলে তুচ্ছকে তার তুচ্ছতার মধ্যে রেখে তার সৌন্দর্যকে আস্বাদন করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে সম্ভব হোতো না। তাঁর মনের ছোঁয়ায় তুচ্ছ তার তুচ্ছতার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে একটা ঊর্ধ্বমুখী গতি নিত।

এই সামান্য পার্থক্য সত্ত্বেও মূলত বিভূতিভূষণের প্রকৃতি চেতনা রবীন্দ্র-সগোত্র।

রবীন্দ্রনাথের আর যে বৈশিষ্ট্যটি সম্পর্কে তিনি সচেতন, সেটি তাঁর ক্ষেত্রেও বর্তমান। তিনিও সাধারণের দুরধিগম্য চেতনা-স্তরে গিয়ে প্রকৃতি-আবরণের অন্তরালে নতুন শক্তির উৎসমুখের সন্ধানী। তাঁর অপু 'চেতনা-স্তরের আর একটা dimension' খুঁজে পেয়েছে। (অপরাজিত, পৃঃ ৪০৪)। 'দৃষ্টিপ্রদীপের' নায়কও বলে, 'আমি আমার বিরাট চেতনার রথচক্র চালিয়ে দিই শতাব্দী থেকে শতাব্দীর পথে, জন্মকে অতিক্রম ক'রে আবার আনন্দ-ভরা নবজন্মের কোন অজানা রহস্যের আশায়।' (দৃষ্টিপ্রদীপ, পৃঃ ১৮০)

জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে এ চেতনা ক্রমাগত চলমান বলে মৃত্যু তাঁর কাছে আশঙ্কার নয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে মৃত্যু যেমন মাতার স্তন থেকে স্তনান্তরে আশ্রয় পাবার সামিল, বিভূতিভূষণও মৃত্যুর এক নব রূপ দেখেছেন। তাঁর কাছেও জীবন ও মৃত্যু উভয়ের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর আর এক জীবন সৃষ্ট হয়। 'নদীর ধারে আজিকার এই আসন্ন সন্ধ্যায় মৃত্যুর নব রূপ সে দেখিতে পাইল। মনে হইল যুগে যুগে এ জন্মমৃত্যুচক্র কোন বিশাল-আত্মা দেবশিল্পীর হাতে আবর্ত্তিত হইতেছে—তিনি জানেন কোন্ জীবনের পর কোন্ অবস্থার জীবনে আসিতে হয়, কখনও বা সঙ্গতি, কখনও বা বৈষম্য—সবটা মিলিয়া অপূর্ব রসসৃষ্টি—বৃহত্তর জীবনসৃষ্টির আর্ট।' (অপরাজিত, পৃঃ ৪০৪)

চেতনাস্তরের এই নতুন dimension-এর কাছে এ জগৎ এবং ও জগৎ প্রায় একই সঙ্গে মেশামেশি করে আছে; কোন নির্দিষ্ট

সীমারেখা দিয়ে দুই জগতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটানো যায় না। বিশ্বচরাচরের বস্তুরূপ ও অধ্যাত্মরূপ একই সঙ্গে সত্য, বিভূতিভূষণের কাছে বেশী সত্য—অধ্যাত্মরূপটা। সেইটাই তাঁর কাছে 'প্রকৃত রূপ'। চেতনাস্তরের সেই dimension যাদের অনায়ত্ত, তারা শুধুমাত্র বস্তুরূপে আবদ্ধ। নির্জনে বসলেই বিভূতিভূষণের মনে হয়, 'এই পৃথিবীর একটা আধ্যাত্মিক রূপ আছে, এর ফুলফল, আলোছায়ার মধ্যে জন্মগ্রহণ করার দরুণ এবং শৈশব হইতে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার দরুণ, এর প্রকৃত রূপটি আমাদের চোখে পড়ে না। এ আমাদের দর্শন ও শ্রবণগ্রাহ্য জিনিষে গড়া হইলেও আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও ঘোর রহস্যময়, এর প্রতি রেণু যে অসীম জটিলতায় আচ্ছন্ন—যা কিনা মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত এ সত্যটা চোখে পড়ে না। (অপরাজিত, পৃঃ ৪০৩) *

'এই অদৃশ্য জগৎটায় মোহস্পর্শ' (অপরাজিত, পৃঃ ২৮৭) কিন্তু বিভূতিভূষণের কাছে অত্যন্ত সহজে এসে পৌঁছোয়। 'বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত' জগৎ এবং চেতনাস্তরের নতুন dimension—এই দুয়ের সংস্পর্শের কাহিনী অপু-কাহিনীতে সুরু হয়ে দৃষ্টিপ্রদীপ † ও

* 'অপরাজিত' লেখবার কালের সমসাময়িক ডায়রী 'তৃণাঙ্কুরে' রয়েছে : 'একটা কথা আজকাল নির্জনে ব'সে ভাবলেই বড় মনে পড়ে। এই পৃথিবীর একটা spiritual nature আছে, আমরা এর গাছপালা, ফুলফল,, আলোছায়া, আকাশ-বাতাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেচি বলে, শৈশব থেকে এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ বলে, এর প্রকৃত রূপটি ধরা আমাদের পক্ষে বড় কঠিন হয়ে পড়ে। এই অপূর্ব সৃষ্টি যে আমাদের দর্শন ও শ্রবণ-গ্রাহ্য বস্তুসমূহ দ্বারা গঠিত হয়েও আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও ঘোর রহস্যময়, এর প্রতি অনু যে অসীম সম্ভাব্যতায় ভরা, মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত এক জটিলতায় আচ্ছন্ন, তা হঠাৎ ধরা পড়ে না।' (পৃঃ ৩)

† 'দৃষ্টিপ্রদীপে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মাধ্যমে ভাবী ঘটনার ছায়াপাত হোতো। এই জাতীয় কাহিনী রচনার প্রেরণা তিনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন? রবীন্দ্রনাথে অনুরূপ কিছু নেই। ডি এইচ. লরেন্সের 'The Rocking-Horse Winner'-এর নায়ক Paul অনুরূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের বলে ভাবী বিজেতা-অশ্বের, নাম জানতে পারত। অবশ্য এই বিষয়টি ছাড়া দুটি কাহিনীতে আর কোন মিল নেই। লরেন্সের গল্পের স্বাদ সম্পূর্ণ আলাদা। এ যুগের স্বর্ণতৃষার অতি বাস্তব একটি সমস্যার বিপুল আবেগময় আলোড়নে পূর্বোক্ত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের বিষয়টি সেখানে বরং গৌণ। সাহিত্যিক

আরণ্যকের মধ্য দিয়ে ইছামতী—দেবযান—কুশলপাহাড়ীতে প্রসারিত। আর কতগুলি গল্পও এই গতিরেখার উপর বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো।

বিভূতিভূষণে এই বিশেষ চেতনলোকের অভিজ্ঞতার কাহিনী কোথাও সূক্ষ্ম, কোথাও অত্যন্ত স্থূল। 'অপরাজিত' বা 'ইছামতী'-তে একটা সূক্ষ্ম অধ্যাত্মরূপকে ধরবার প্রচেষ্টা তাঁর আছে। 'আরণ্যকে'-র অতিলৌকিক ঘটনাটির বর্ণনা, দেবযান, কতগুলি অতিপ্রাকৃত গল্প * প্রভৃতির রূপায়ন অত্যন্ত স্থূল। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচৈতনার সঙ্গে বিভূতিভূষণের এইখানে একটা পার্থক্য। স্থূল অর্থে যাকে আমরা অতিলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত বলে থাকি, তার ভিত্তিতে নিছক ভূতুড়ে কাহিনী রবীন্দ্রনাথ একটাও লেখেননি। বিভূতিভূষণ অসংখ্য লিখেছেন। এর মূলে রয়েছে বিভূতিভূষণের কিশোরসুলভ বিশ্বাস-প্রবণতা। বালকের মত সরল আস্থায় তিনি সব কিছুকে বিশ্বাস করেছেন। রবীন্দ্রনাথে আছে এক ধরণের পরিণত প্রজ্ঞা। বিভূতি সাহিত্যের বহু স্থানে অপেক্ষাকৃত অপরিণত মনের আন্তরিক সারল্য অতি-প্রকট। তাতে সরলতার স্বাদ আছে, গভীরতার অভাব আছে।

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের মুখে শুনেছি, বিভূতিভূষণ বলতেন যে তিনি দৃষ্টিপ্রদীপের প্রেরণা অংশত পেয়েছেন Dean Inge-র লেখা পড়ে। গৌরীবাবু বিভূতিবাবুর একাধিক বইয়ের প্রকাশক এবং তাঁর জীবৎকালের ঘনিষ্ট সুহৃদ। সুতরাং তাঁর কথার গুরুত্ব আছে। তাঁর উক্তির কিঞ্চিৎ সমর্থন বিভূতিবাবুর ডায়রী 'তৃণাঙ্কুরে' পেয়েছি: 'Dean Inge যাকে Joy of Life বলেচেন, তা আমি এই গত মাসটিতে প্রাণে প্রাণে অনুভব করেচি। সেরকম নিভৃত,শান্ত, শ্যামল মাঠ ও কালো-জল নদীতীর না হলে মনের আধ্যাত্মিক পুষ্টি কেমন করে হবে?…জীবনের সার্থকতা …জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার ভেতরে, বিশ্বের রহস্যকে বুঝতে চেষ্টা করবার আনন্দের মধ্যে, এই সব শান্ত সন্ধ্যায় বসে এই অসীম সৌন্দর্যকে উপভোগ করায়। …এরকম এক একটা সময় আসে যখন বিদ্যুৎচমকে অনেকখানি অন্ধকার রাস্তা একেবারে দেখতে পাওয়ার মত সারা জীবনের উদ্দেশ্য ও গভীরতা যেন এক মুহূর্তে জানতে পারা যায়। একে সকলে চিনতে পারে না, ধরতে পারে না।… শিমুল গাছের মাথাটার উপরকার আকাশটার দিকে চেয়ে দেখে নিয়ে বামে নতিডাঙ্গার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিতেই রক্ত-মেঘস্তূপ যেন যুগান্তের পর্বতশিখরের মত আকাশের নীল স্বপ্নপটে—তার ওপারে যেন জীবন পারের বেলাভূমি আনন্দ আবছায়ার মত সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার একটু একটু চোখে পড়ে।' (পৃঃ ১—২)

* 'ছোটগল্প' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ঐ সারল্যের পথেই বিভূতিভূষণ এসে উপস্থিত হয়েছেন তাঁর পারলৌকিক চিন্তা-প্রসঙ্গে। এখানেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিরাট ব্যবধান।

• Astronomy-তে বিভূতিভূষণের বিশেষ আগ্রহ ছিল। পড়াশুনোও করতেন এ বিষয়ে। (দ্রষ্টব্য, 'তৃণাঙ্কুর' পৃঃ ৬২) নক্ষত্রলোকের দিকে তাকিয়ে তিনি সরল মনে বিশ্বাস করতেন, 'আকাশের অগণ্য তারায় তারায় কত দেবলোক, কত পৃথিবী, কত জগৎ—কত অগণিত প্রাণীকুল, কত দেবশিশু—' (তৃণাঙ্কুর, পৃঃ ৭১)। এটাকে তিনি চৈতন্যের প্রসার মনে করতেন। এই ব্যাপ্ত চৈতন্যের শেষ অঙ্কে তিনি একথাও ভাবতেন যে ঐ নক্ষত্রলোকে এককালে তিনি ছিলেন, এবং ভবিষ্যৎ কালে আবার থাকবেন। তাঁর চৈতন্য কি কি বিষয়ের মধ্যে দিয়ে ব্যাপকতা লাভ করে তার পরিচয় দানের সময় শেষ পর্বে বলছেন 'মৃত্যুপারের দেশ, মৃত্যুপারের বিরাট জীবনে'র কথা। (তৃণাঙ্কুর, পৃঃ ৭২)। নক্ষত্রলোকে, তাঁর ধারণা, বাস করে 'কত উচ্চস্তরের জীবকুল।' (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ৮৩)। 'ওই দূর আকাশের নক্ষত্রটি—ওর মধ্যেও স্নেহ, প্রেম যদি না থাকে তবে ওর সার্থকতা কিছুই নয়।' (তৃণাঙ্কুর, পৃঃ ১০৬) তাঁরও 'অশান্ত প্রাণপাখী আর মানে না।' সে-ও জৈবিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি নিয়ে ঐ আলোকদেহী উচ্চ জীবকুলে মিশে যেতে চায়। সেখানে ইচ্ছাই সৃষ্টি, আলোকপক্ষ সেখানে যান। (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ৩১)। আনন্দের মুহূর্তে পার্থিব দেহসত্তার বন্ধনকে অতিক্রম করে তাঁর কেবলই মনে হয়, 'আমি পৃথিবীর কেউ নই—আমি দেবতা—এই মুহূর্তে পাখা ছেড়ে এই মেঘভরা আকাশ চিরে ওপারে বহুদূরে কোথায় উড়ে যাবো।' (তৃণাঙ্কুর, পৃঃ ৭৪)

আকাশ চিরে উড়ে যাওয়ার প্রয়াস তাঁর বহু গ্রন্থেই আছে। কিন্তু সব চেয়ে চরম উত্তরণ তাঁর ঘটল 'দেবযানে'। তাঁর astro-

nomy-র আকাশলোকের সঙ্গে হিন্দু-সংস্কার-নির্দিষ্ট মৃত্যু-উত্তর জগতের বিশেষ ব্যবধান রইল না। সরল কিশোর-সুলভ বিশ্বাসে দুটো জগতকে তিনি এক করে মিশিয়ে নিলেন। তাঁর মনে বিজ্ঞান ও হিন্দু সংস্কারের দ্বন্দ্ব ছিল না। তিনি Max Planck-এর এই উক্তি সমর্থন করে গিয়েছেন, 'There can never be any real opposition between religion and scicnce; for one is the complement of the other.' (হে অরণ্য কথা কও, পৃঃ ৩২)

Quaint বিষয়ের প্রতি বরাবরই বিভূতিভূষণের একটা আগ্রহ ছিল। তিনি নিজেই একাধিক স্থানে তার উল্লেখ করে গিয়েছেন। তাঁর কর্তব্য কর্মের যে লিষ্ট তিনি তৃণাঙ্কুরে দিয়েছেন, তার অন্যতম হচ্ছে 'Quaint ধরণের লোকের সঙ্গে আলাপ।' (পৃঃ ৬২)। ঐ লিষ্টেরই পঠিতব্যের তালিকায় আনাতোল ফ্রাঁসকে রেখেছেন; এবং কিছুটা পরে বলছেন, 'আনাতোল ফ্রাঁসের Procurator of Judea গল্পটি খেতে খেতে ওদের কাছে কর্লুম—রসের বৈচিত্র্য ও Quaintness হিসেবে।' (পৃঃ ৭০) তাঁর Quaint-প্রীতি কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে তার সব চেয়ে বড় নমুনা 'দেবযান'।

পথের পাঁচালী-অপরাজিতের সময় থেকেই বিভূতিভূষণের Spiritualism-এর প্রতি বিশ্বাস ও আগ্রহ ছিল। এবং এ বিষয়ে তিনি চর্চাও করতেন। 'তৃণাঙ্কুরে' পাই: 'অতুলবাবুর কাছে একটা Spiritual circle-এর ঠিকানা নিলুম।' (পৃঃ ৫৬) অথবা অন্যত্র: 'গোপাল হালদারের সঙ্গে Spiritualism নিয়ে সেখানে ঘোর তর্ক।' (পৃঃ ৬৩)। গোপাল হালদার মার্কস্‌পন্থী, অতএব তিনি যে Spiritualism-সম্পর্কিত বিতর্কে কোন পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন বোঝাই যায়। নিঃসন্দেহে বিভূতিভূষণ Spiritualism-এর স্বপক্ষে তর্ক চালিয়েছিলেন।

আত্মার ব্যাপ্তি-প্রয়াস রবীন্দ্রনাথেও স্পষ্ট। তিনিও নিজেকে স্থূল জৈবিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাননি। বৃহৎ পরিধির মধ্যে গিয়ে নিজেকে উপলব্ধি করা তাঁর আত্মার ধর্ম। কিন্তু এই ধর্ম আচরণে তাঁকে Spiritualism-এর আশ্রয় নিতে হয়নি। রবীন্দ্রনাথে আত্ম-প্রসারণের উপায় পারলৌকিক নয়, বা স্থূল অর্থে যাকে আমরা অতিলৌকিক বলি তাও নয়। জন্মান্তর -সংস্কার তাঁর পথ নয়। জাগতিক বা নাক্ষত্রিক শূণ্যে অদৃশ্য জগতের অশরীরীদের সঞ্চরণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। 'মাস্টারমশায়', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে' প্রভৃতি নাম স্মরণে রেখেও বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত কোন বিষয়ে কাহিনী লেখেননি। বরং বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির একটা সংস্কার তাঁর আত্মব্যাপ্তির প্রয়াস-মুহূর্তেও হয়তো অবচেতনে সক্রিয় থাকত। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করতেন, তৃণগুচ্ছের মধ্যে তৃণ হিসেবেই একদিন তাঁর প্রাণসত্তা স্পন্দিত ছিল, পৃথিবীর তরলিত শৈশবের সেই সামুদ্রিক জঠরে একদিন তিনি লীন ছিলেন, সূর্যের প্রাণশক্তির মধ্যেই একদিন তাঁর আত্মা একটা তেজঃ-কণিকা হিসেবে বর্তমান ছিল। তৃণে, গুল্মে, সমুদ্রে, বসুন্ধরায়, সূর্যে—এবং বৃহৎ কালপরিধিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে পরিব্যাপ্ত করে দিয়ে বড় করে নিজেকে অনুভব করতে চান, কিন্তু তাঁর এই বিশেষ কল্পনাটি বৈজ্ঞানিক চেতনার একটি প্রচ্ছন্ন বৃন্তে বিধৃত।/

রবীন্দ্রনাথের কল্পনাসমৃদ্ধি বিভূতিভূষণে ছিল না, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমাদের বক্তব্য মাত্র সেইটুকু নয়। / বিভূতিভূষণ বহুক্ষেত্রে কল্পনাকে পরিহার করে কাল্পনিকতাকে আশ্রয় করেছেন; সেই আতিশয্যের চড়া সুর বহু সময় convincing নয়। এখানে 'কল্পনা' ও 'কাল্পনিকতা' শব্দ দু'টি রাবীন্দ্রিক সংজ্ঞা অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কল্পনা এবং কাল্পনিকতা দুইয়ের

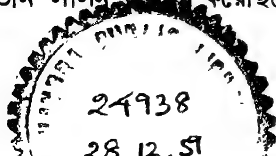
মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ আছে। যথার্থ কল্পনা, যুক্তি সংযম এবং সত্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট আকারবদ্ধ—কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে মাত্র কিন্তু তাহা অদ্ভুত আতিশয্যে অসঙ্গতরূপে স্ফীতকায়। তাহার মধ্যে যেটুকু আলোকের লেশ আছে ধূমের অংশ তাহার শত গুণ। যাহাদের ক্ষমতা অল্প তাহারা সাহিত্যে প্রায় এই প্রধূমিত কাল্পনিকতার আশ্রয় লইয়া থাকে—কারণ, ইহা দেখিতে প্রকাণ্ড কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত লঘু।'

বিভূতিভূষণে এই আতিশয্য অনেক ক্ষেত্রে আছে। 'দেবযানে'র আত্মব্যাপ্তি সম্পর্কেও ঐ কথা বলা যায়, 'ইহা দেখিতে প্রকাণ্ড, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত লঘু।'

শৈশবে মানুষের মনের কাছে অনেক কিছু এসে দাঁড়ায়। মন তার তখন সেগুলিকে নিয়ে নতুন জাগে। সে মনের কাছে ঐ জেগে ওঠাটাই বড়, অবলম্বনটা বড় কথা নয়। তাই মনের তখন তার বাদ-বিচার নেই। তার জগতে তখন কল্পনা ও কাল্পনিকতায় সীমারেখা টানা নেই। কাল্পনিকতার জগৎ তখন প্রকাণ্ড, এবং তার কাছে মস্ত বড় সত্য। যত মনের বয়স হয় তত সে অভিজ্ঞতা ও চিন্তা দিয়ে কাল্পনিকতা-পূর্ণ সেই বিরাট ফানুসটা 'সুনির্দিষ্ট আকার-বদ্ধ' করে। সেই কল্পনা যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, তেমনি সংযত। মনের এই balance যথার্থ কল্পনার পক্ষে অপরিহার্য। বিভূতিভূষণে অনেক সময় এটি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাঁর মনের একটা বড় অংশ চিরকালই শিশু থেকে গিয়েছিল। সেই শিশুটা কাল্পনিকতায় আনন্দ পেতো, তাই তিনি ওটা পূরো পরিহার করতে পারেননি। 'দেবযানে'র পরলোক-বার্তা ঐ কাল্পনিকতার একটি বড় উদাহরণ।

বিভূতিভূষণে এই অ-রাবীন্দ্রিক পরলোক-প্রীতি কোথা থেকে এল ?

শৈশবের হিন্দু-সংস্কার তাঁর পরলোকচিন্তার প্রাথমিক উৎস। এটিকে তিনি লালন ও পুষ্ট করেছিলেন নানাবিধ চর্চায়। এই বিষয়টিকে



সাহিত্যে রূপ দেবার প্রেরণা কি তিনি পেয়েছিলেন ইংরেজ লেখিকা মারী করেলী-র কাছ থেকে?

বিভূতিভূষণের যখন তরুণ বয়স, তখন মারী করেলী বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। মারী করেলীর মনের সঙ্গে বিভূতিভূষণের মনের অনেক সাদৃশ্যও আছে। মারী করেলী নাগরিক অর্থাসক্তি, কৃত্রিমতা, জটিলতা ও গতানুগতিক জীবনধারা বাদ দিয়ে শান্ত অনাড়ম্বর প্রকৃতির পক্ষপাতী। প্রকৃতি মারী করেলীর কাছে 'the divine goddess (God's Good Man. পৃঃ ১) এবং 'Mother Nature' (ঐ, পৃঃ ১৬১)। ছোটখাট প্রাকৃতিক ঘটনানিচয়ের মধ্যে নির্বাক আমন্ত্রণবাণী ('wordless invitation'। ঐ, পৃঃ ২৬) শুনতে পেয়ে তিনিও যেতে চান into the fair freedom of Nature (বিভূতিভূষণ যেতে চান 'মুক্তরূপা প্রকৃতির কোলে।')। আর সেখানে দাঁড়িয়ে নয়ন-মন অভিষিক্ত করে নিলে মানুষের অস্থির কর্মকাণ্ডকে মনে হয় অনাবশ্যক নিরর্থক ধৃষ্টতা (all the restless work of man seems an impertinence rather than a necessity.—The Secret Power. পৃঃ ৬৭)।

তিনিও প্রকৃতি-লালিত তরুরাজিকে নিধন করার বিরোধী। 'God's Good Man' গ্রন্থের নায়িকা বৃক্ষকে শুধু নিষ্ঠুর হত্যার হাত থেকে বাঁচায় না, উইল করে যায় ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য। "They shall never be touched in my lifetime,...I believe I'll put something in my last will and testament about them—something binding, you know! Something that will set up a block in the way of land agents. Such trees as these ought to stand as long as Nature will allow them." (—পৃঃ

১৫৮)। গাছও কৃতজ্ঞতাবোধে সাড়া দেয়ঃ The wind rustled softly through the boughs, which bent and swayed before her, as though the grand old trees said : 'Thanks to you, we live !' (পৃঃ ৩২১)। God's Good Man-এর নায়িকা ছিল জমির মালিক। সে প্রকৃতির সম্পদকে রক্ষা ক'রে গিয়েছিল। 'আরণ্যকে'র নায়ক ছিল জমিদাররের কর্মচারী। নিজে হাতে বৃক্ষছেদনের বেদনায় সে বিদ্ধ।

মারী করেলী মানুষের সেই রূপটা বড় করে দেখেছেন যা সততা ও সারল্যে শান্ত, আস্তিক-ভাবনায় স্থিতধী, প্রকৃতি-রসের রসিক, প্রেমের জগতে দেহোর্ধ্ব, একনিষ্ঠতায় আদর্শ।

একালের মানুষের সম্পর্কে মারী করেলীর খুব বড় একটা অভিযোগ ছিল যে তাদের কল্পনাশক্তি ও অনুভূতিশক্তি কমে যাচ্ছে। এ যুগে "all imagination, all poetry, all instinctive sense of the divine, is being subordinated to what we consider as Fact." (ঐ, পৃঃ ২৯৪)। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও এর প্রতিফলন ঘটেছেঃ 'Nowadays, the authors that are most praised go in for what they call 'realism',—and their realism is very unreal, and very nasty. For instance, this garden,—these lovely trees,—this dear old house—all these are real—but much too romantic for a modern writer. He would rather describe a dusthole and enumerate every potato paring in it. (ঐ, পৃঃ ১৩১) এর কারণ তিনি মনে করতেন কল্পনা শক্তির দৈন্য।* এই দৈন্যকে বরাবর

* Philosophical Institution, Edinburgh-এ তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার বিষয় ছিল—The Vanishing Gift। এই gift-টি মানুষের imagination.

তিনি মোচন করবার চেষ্টা করেছেন তাঁর সাহিত্যে—সৌন্দর্যসন্ধানী কল্পনার রথচালনার মাধ্যমে। সে-রথ পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের সন্ধানে অনেক সময় বল্‌গাহীন। তাঁর কল্পনা-রথের গতি শুধু এ জগতে সীমাবদ্ধ নয়—অন্য জগতেও তার গতি অবাধ। তাঁর রোমান্‌স্‌ শুধু এ জগৎকে নিয়ে নয়, পরজগৎকে নিয়েও। তাঁর Romance হচ্ছে 'of two worlds'.

বিভূতিভূষণেরও তাই। তাঁর বল্‌গাহীন রথও শুধু এ জগতের পথে থেমে থাকতে চায় না, উত্তরলোকে তাঁর মানসযাত্রা।

বিভূতিভূষণ ও মারী করেলী উভয়েই সরল বিশ্বাসে পরলোকের আলোচনা করেছেন তাঁদের উপন্যাসে। পারলৌকিক সত্তাদের চেহারা, আচরণ, বাক্‌ভঙ্গী ইত্যাদির বর্ণনায় উভয়ের সাদৃশ্য আছে।

চেহারার প্রতিচ্ছায়া এঁকেছেন মারী করেলী এইভাবে: "The cabin was filled with a pearly lustre like the vapour which sweeps across the hills in an early summer dawn—and in the centre of this as in an aureole stood a nobly proportioned figure, clad in gold-coloured garments fashioned after the early Greek models. Presumably this personage was human,—but never was a semblance of humanity so transfigured. The face and forms were those of a beautiful youth,—the eyes were deep and brilliant,—and the expression of the features was one of fine serenity and kindliness." (The Secret Power, পৃঃ ২২৩) 'দেবযান'-এর পরলোকবাসীরাও অনুরূপ জ্যোতির্বলয়িত আলোকসত্তা।

উভয়ের পরজগতে মুখ্য প্রেরণা প্রেমানুভূতি। আলোর গতির

পথে সেখানে সানন্দ যাত্রা! সৌন্দর্যের দ্যুতি সেখানকার প্রতিটি অনুতে, প্রতিটি প্রাণীতে।

বস্তুত, বিভূতিভূষণের 'দেবযান' পড়বার সময় মারী করেলীর বইয়ের (A Romance of Two Worlds প্রভৃতি) কথা মনে পড়া অত্যন্ত স্বাভাবিক।

॥ দুই ॥

॥ ইছামতী ও পদ্মা ॥

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিভূতিভূষণের বড় সাদৃশ্য জীবনদৃষ্টির ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদ আনন্দবাদে বিশ্বাসী। তিনি জানেন পরম আনন্দসত্তা এ জীবনের উৎস। জীবনান্তের মোহানাও এক আনন্দসঙ্গম। সৃষ্টির উপর আনন্দসত্তার নিত্য স্পর্শ। তাই কোন ক্ষয়-ক্ষতিই বড় নয়। এমন কি মৃত্যুও নয়। মৃত্যু আর এক সুন্দর জগতের দ্বার উন্মোচন করে। সে তো মাতার এক স্তন থেকে স্তনান্তরে প্রয়াণ।

বিভূতিভূষণও এই দৃষ্টিতেই জগৎকে দেখেছেন। তাঁর গল্প উপন্যাস ডায়েরীর প্রতি ছত্রে এর অনুরণন। রবীন্দ্রনাথের মত বিভূতিভূষণও অসংখ্যবার তাঁর ডায়েরীতে 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে' প্রভৃতি পংক্তি উদ্ধার করেছেন। 'তৃণাঙ্কুরে' (পৃঃ ৩৩) বলেছেন, "গুন গুন করে বানিয়ে গাইলুম, আপনিই মুখে এসে গেল ঃ—'গভীর আনন্দরূপে দিলে দেখা এ জীবনে হে অজানা অনন্ত—'।" তাঁর মুখের এ ভাষা যে রবীন্দ্রনাথের, তা বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না।

তিনি জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি হতাশা-নিরাশাকে বড় একটা দেখেননি দেখেছেন জীবনব্যাপী আনন্দ-বিকিরণ। বিষাদ বলতে বুঝতেন রোমান্টিক-সুলভ "Emotional Sadness।" এটা Romantic Melan-choly-র সগোত্র। তিনি ভাবতেন, 'emotional Sadness জীবনের একটা খুব বড় সম্পদ।' (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ১৮)। মরণোত্তর এক অতিসুন্দর জগৎ সম্পর্কেও তাঁর ধারণা কত প্রবল ছিল তার উদাহরণ

'দেবযান।' মৃত্যু শুধু এক আনন্দলোক থেকে আরো বড় এক আনন্দলোকে প্রয়াণের একটি দ্বার মাত্র।*

(দু'একজন সমালোচক হার্ডির সঙ্গে বিভূতিভূষণের সাদৃশ্যের কথা বলেছেন। প্রকৃতিমুখিতায় ও আধুনিক সভ্যতার প্রতি বিরূপতায় উভয়ের কিছুটা সাধর্ম্য বর্তমান। কিন্তু তাঁদের গুরুতর পার্থক্য জীবনদৃষ্টিতে। বিভূতিভূষণ আনন্দবাদে বিশ্বাসী আর হার্ডি বিশ্বাসী এক ধরণের দুঃখবাদে। বিভূতিভূষণে জীবন, জগৎ ও প্রকৃতি এক সানন্দ সালোক স্বপ্নলীলা, হার্ডিতে দুর্জ্ঞেয় এক অন্ধকার নিয়তির খেলা।)

উভয়ের সাদৃশ্য আরও আছে। বিভূতিভূষণের মতে, 'জীবনকে যারা দুঃখময় বলেচে, তারা জীবনের কিছুই জানে না, জগৎটাকে দুঃখময় মনে করা নাস্তিকতা। জগৎ হোল সেই আনন্দময়ের বিলাস বিভূতি।' (ইছামতী, পৃঃ ১৩)।

তবে দুঃখেরও মূল্য আছে, কারণ 'দুঃখকে বাদ দিয়ে জগতে সুখ নেই—প্রকৃত সুখের অবস্থা গভীর দুঃখের পরে···দুঃখের পূর্বের সুখ অগভীর, তরল খেলো হয়ে পড়ে—দুঃখের পর যে সুখ—তার নির্মল ধারায় আত্মার স্নানযাত্রা নিষ্পন্ন। (ইছামতী, পৃঃ ৩১২)। রবীন্দ্রনাথ জানেন যে তাঁর দীপকে না জ্বালালে আলো দেয় না, না পুড়লে ধূপ দেয় না সুরভি; তীব্র দহনের মধ্যেই হৃদয় আলোকে আশ্রয় পায়; 'প্রভাতের স্নিগ্ধতাকে মধ্যাহ্নতাপে দগ্ধ করিয়া তবেই সায়হ্নের লোকলোকান্তরব্যাপী বিরাম।' (শকুন্তলা, প্রাচীন সাহিত্য)।

রবীন্দ্রনাথের সীমা-অসীমের তত্ত্ব-ও বিভূতিভূষণ তাঁর নিজস্ব ধরনে গ্রহণ করেছিলেম। বিভূতিভূষণ বলেন, 'ভগবানের আসল তত্ত্ব শুধু স্বরূপে সীমাবদ্ধ নয়, স্বরূপ ও লীলাবিলাস দুটো মিলিয়ে

* মারী করেলী বলেন, "Your whole life is an interval of happiness between this world and the next." (The Secret Power. পৃঃ ১০৬)

ভগবৎ-তত্ত্ব। কোনটা ছেড়ে কোনটা পূর্ণ নয়। এই শিশু, এই নদীতীর সেই তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত জিনিষ। সে থেকে প্রথম নয় —সেই মহা-একের অংশ মাত্র।' (ইছামতী, পৃঃ ৩৫৮)।

তাই এ বিশ্বপ্রকৃতির সবকিছু ঐ কুমুদ ফুলটাও তাঁর মন্দির— 'তাকে (প্রকৃতিকে) ভালবেসে সেই প্রকৃতিরই সাহায্যে প্রকৃতির অন্তরাত্মা সেই মহান শক্তির কাছে পৌঁছতে হবে।' (ইছামতী, পৃঃ ৩৭৪)। আর রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ফুলও আমাদের কাছে সেই প্রিয়তমের দূত হয়ে আসে।...সংসারের পারের খবর নিয়ে আসে ঐ ফুল। সে চুপি চুপি আমাদের কানে এসে বলে,—আমি এসেছি, আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন। আমি সেই সুন্দরের দূত, আমি সেই আনন্দময়ের খবর নিয়ে এসেছি।' (শ্রাবণসন্ধ্যা, শান্তিনিকেতন)

রবীন্দ্রনাথেরও একটা গভীর মন 'সহজ সরল' সুখের জন্য পিপাসিত; আধুনিক সভ্যতার জটিলতা, যান্ত্রিকতা ও কৃত্রিমতায় ক্ষুব্ধ মানুষের সভ্যতার অন্তরে সরলতা প্রতিষ্ঠায় প্রত্যাশী। গ্রামের সরল একটি চাষীর কথা শোনবার পর তাঁর মনের ভাব এই রকম: 'এদের উপর যে আমার কতখানি শ্রদ্ধা হয়, আপনার চেয়ে যে এদের কতখানি ভাল মনে হয়, তা এরা জানে না।' (ছিন্নপত্র, ৯৬ নং পত্র।)

শুধু শ্রদ্ধা জানিয়েই ক্ষান্ত নন রবীন্দ্রনাথ, সভ্যতার মর্মে ঐ সরলতার স্থান হওয়া যে একান্ত কাম্য, সে কথাটিও উল্লেখ করেছেন: 'যতক্ষণ না সভ্যতার মাঝখানে এই স্বচ্ছ সরলতার প্রতিষ্ঠা হয় ততক্ষণ সভ্যতা কখনই সম্পূর্ণ এবং সুন্দর হবে না। সরলতাই মানুষের স্বাস্থ্যের একমাত্র উপায়— সে যেন গঙ্গার মত, তার মধ্যে স্নান করে সংসারের অনেক তাপ দূর হয়ে যায়।' (ঐ পত্র)। রবীন্দ্র মনোভাবের এই প্রবাহ বিভূতিমানসে অত্যন্ত স্পষ্ট। বিভূতিভূষণের বরং এই ঝোঁক আরও বেশী। যার ফলে বিভূতি-ভূষণের মন যতটা গ্রামীণ বা আরণ্য, কোন কোন ক্ষেত্রে যতটা সভ্যতা-বিরূপ, রবীন্দ্রনাথের মন তা নয়। বিভূতিভূষণ উল্লাসের সঙ্গে তাঁর

আশার (এবং অন্য মানুষের আশঙ্কার) কথা বলেছেন যে অরণ্য একদিন গম্ভীর ব্যাপক পদক্ষেপে সভ্য লোকালয়কে লেহন করে নেবে এবং নিজের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করবে। এ কথা রবীন্দ্রনাথ বলতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথের মন বিভূতিভূষণের মত অতটা একপেশে নয়, ভার-সামঞ্জস্য সে মনের অনেক বেশী। তাই আধুনিক সভ্যতার 'তাপ' সত্ত্বেও সেদিক থেকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি এর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত। এর মধ্য দিয়েই পথ পরিষ্কার করে অগ্রসর হতে হবে তা তিনি জানতেন। ঐ চিঠিতে যেমন বলছেন, 'এখানকার মানুষের মধ্যে যে জিনিষটি আছে সে বড় অনাদরের নয়।' তেমনি আবার একথাও বলেছেন, 'তবু প্যারিসের সভ্যতা থেকে কত তফাৎ। সে এর চেয়ে কত কঠিন, কত উজ্জ্বল, কত সুগঠিত।'

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সভ্যতাকে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন, বিশ্লেষণ করেছিলেন; শৈশব-শিক্ষা থেকে মানবমনে প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ সরলতার প্রতিষ্ঠায় প্রয়াস ছিল তাঁর। বিভূতিভূষণ একে আয়ত্ত করতে চাননি, বিশ্লেষণ-বিমুখ তাঁর মন, সমাজে সারল্য-প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে উদ্যমহীন। সরলতার মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করে সুখী তিনি। বিভূতিভূষণের ভাবনা বেশী নিজেকে নিয়ে; রবীন্দ্রনাথের—নিজেকে ও দশকে নিয়ে। বিভূতিভূষণ গ্রামীণ, ও এক সুরে বাঁধা তাঁর মন; স্বীয় জীবনের সরলীকরণে তাঁর সাফল্য অনেক বেশী। রবীন্দ্রনাথ নগর-সন্তান, ইয়োরোপের বিচিত্র জটিল সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তাঁর যথেস্ট, সরলীকরণের তৃষ্ণা ও প্রয়াস সত্ত্বেও তাঁর সাফল্য সীমিত। প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ সরলতার সান্নিধ্যে এলে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়, "এই তো বেশ আছি; মায়ের কোলের মধ্যে সন্তান যেমন একটি উত্তাপ, একটী আরাম. একটী স্নেহ পায়, তেমনি এই পুরাতন প্রকৃতির কোল ঘেঁসিয়া বসিয়া একটী জীবনপূর্ণ আদরপূর্ণ মৃদু উত্তাপ চতুর্দিক হইতে আমার সর্বাঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। তবে এই ভাবে থাকিয়া গেলে ক্ষতি কী।" (মন, পঞ্চভূত)। কিন্তু ইচ্ছা করলেও ঐভাবে থাকতে পারেন না

রবীন্দ্রনাথ। কারণ, "সভ্যতার খাতিরে মানুষ মন নামক আপনার এক অংশকে অপরিমিত প্রশ্রয় দিয়া অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছে, এখন তুমি যদি তাহাকে ছাড়িতে চাও সে তোমাকে ছাড়ে না।" (মন)। রবীন্দ্রনাথে এই সভ্যতার-বাড়িয়েতোলা মন; সে মনে প্রাপ্ত ও কাম্যের সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বের ট্রাজেডি বর্তমান—যে ট্রাজেডির অস্তিত্ব আধুনিক মানুষের সকলের মধ্যেই অল্পাধিক উপস্থিত। বিভূতিভূষণের মন বেশ কিছুটা পরিমাণে প্রাথমিক (primeveal); মনের সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্যও তাই তাঁর সহজ-আয়ত্ত। আধুনিক মানুষের সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব তাঁর সামান্য। তিনি প্রসন্ন, আত্মতৃপ্ত।

বিভূতিভূষণ রবীন্দ্র-সগোত্র, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিস্তার, গভীরতা, বৈচিত্র্য ও জটিলতা বিভূতিভূষণে নেই, রবীন্দ্র-প্রদর্শিত পথে বিভূতিভূষণের যাত্রা, কিন্তু রবীন্দ্র-সরণি বহু দুরধিগম্য অঞ্চলের গভীরে শাখা-প্রশাখায় বিসর্পিত, সেখানে নিজেকে প্রসারিত করার সাধ্য নিঃসন্দেহে বিভূতিভূষণে দীন।

একজন সমালোচক রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে তুলনা করেছেন পদ্মার সঙ্গে। বিভূতিভূষণের প্রতিভার প্রতীক বলা যায় ইছামতীকে।

রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁর একটি পত্রে (ছিন্নপত্র, ১৪৬ নং পত্র) ইছামতী আর পদ্মাকে পাশাপাশি রেখে কয়েকটি কথা বলেছিলেন, সে-উক্তি বিভূতিভূষণ ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিতুলনার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। ইছামতীকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এ যেন একই কবিতার কয়েকটা লাইন।' বিভূতিভূষণও ঠিক তাই। রবীন্দ্রনাথের মনে হয় 'ছোট বাঁকা নদীটি যেন বিশেষ করে আমার।' বিভূতি-মানসের আত্মীয় মন যাঁদের, তাঁদেরও একথা মনে হবে বিভূতি-সাহিত্যের সান্নিধ্যে এলে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতীক পদ্মা! 'পদ্মার মত বড় নদী এতই বড়ো যে সে যেন ঠিক মুখস্থ ক'রে নেওয়া যায় না।'

বিশেষ ঋতু-নির্ভর নদী ইছামতী—'বর্ষা-মাসের দ্বারা অক্ষরগোনা।'

বিভূতিমানসও প্রকৃতির বিশেষ আবহাওয়ায় জেগে ওঠে, তার বাইরে তাঁর প্রাণের স্ফুরণ হয় না। পদ্মা বর্ষায় হয়তো প্রবল, কিন্তু কোন ঋতুতেই সে স্তিমিত নয়।

'ইছামতী মানুষ-ঘেঁসা নদী;........সে ছেলেদের মাছ ধরবার এবং মেয়েদের স্নান করবার নদী, স্নানের সময় মেয়েরা যে-সমস্ত গল্পগুজব নিয়ে আসে সেগুলি এই নদীটির হাস্যময় কলধ্বনির সঙ্গে এক সুরে মিলে যায়।' গ্রামের অন্তঃপুরের সঙ্গে বিভূতিভূষণের 'মাখামাখি সখিত্ব'। আর পদ্মাকে যত ভালই লাগুক, তাকে বেশ খানিকটা সমীহ করতে হয়।

ইছামতীর 'উপরে ঘনবর্ষার সমারোহের মধ্যে একটি চিঠি লিখতে ইচ্ছা করছে, মেঘলা গোধূলিতে নিরালা ঘরে মৃদুমন্দ স্বরে গল্প ক'রে যাবার মতো চিঠি।' বিভূতিভূষণের জগতে এলেও চিঠির মত ডায়রীর মত একান্ত ব্যক্তিগত একটা সুর মনে জাগে।

পদ্মার জগৎ যেন মৃদু সুরে ব্যক্তিগত আলাপের নয়। দু' একটা মুহূর্ত হয়তো তেমন থাকতে পারে; কিন্তু সে চিঠি নয়, ডায়রী নয়। মহাকাব্যের মত সে বিরাট দেশকালে পরিব্যাপ্ত, ব্যক্তিকে ছাপিয়ে উঠে সে প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত। এক হাতে হিমালয়, আর এক হাতে সমুদ্রকে ধারণ ক'রে বিপুল শক্তিতে সে মুখর। তার অতিকায় বক্ষঃপটে সুবৃহৎ আকাশের প্রতিফলন। ইছামতী যখন বর্ষায় পূর্ণা, রাত্রি যখন গ্রামকে করেছে দূর, ঘাটকে করেছে নির্জন, তখন হয়তো তার ছোট শান্ত বুকে এক ফালি আকাশের কয়েকটি নক্ষত্রের ছায়া পড়ে, সে-নক্ষত্রের সংখ্যা দীন, আলো ক্ষীণ। হয়তো তখন তার মৃদু জলস্রোতে সমুদ্রের ঈষৎ স্পর্শও লাগে, সারা দেহ কাঁপে, সারা প্রাণ তার ধন্য মানে, এর চেয়ে বড় সার্থকতা ধারণের সামর্থ্য নেই তার অঞ্জলিতে। এর চেয়ে বড় স্বপ্ন দেখবার দৃষ্টি নেই তার নয়নের।

লক্ষণীয়, ইছামতীর ঘরোয়া ভাব সত্ত্বেও প্রবলা পদ্মার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ প্রবলতর, পদ্মার প্রতি যেন তার রক্তের টান। সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে সে আত্মীয়তার স্বাক্ষর বর্তমান। আর বিভূতিভূষণের যেন রক্ত-সম্পর্ক ইছামতীর সঙ্গে; গল্প, উপন্যাস, ডায়রীর ছত্রে ছত্রে সে আনন্দ-সম্পর্কের ইতিবৃত্ত লিখিত আছে। আর 'পদ্মা? সেও অপূর্ব সন্দেহ নেই। কিন্তু সে আদরে পালিতা ধনীবধূ, একগুঁয়ে, তেজস্বিনী, শক্তিশালিনী, যা খুশি করে, কেউ আটকাতে পারে না—সবাই ভয় করে চলে—খামখেয়ালী—রূপবতী—তবে মিষ্টি নয়—high-bred রূপ ও চালচলন। ঘরকন্না পাতিয়ে নিয়ে থাকবার পক্ষে তত উপযোগী নয়।' (তৃণাঙ্কুর, পৃষ্ঠ ৮৪)

এ অধ্যায়ের স্বরুতে ছিল রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে বিভূতিভূষণের উক্তি। আর এ প্রসঙ্গের উপসংহার টানি বিভূতিভূষণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি দিয়ে। 'পথের পাঁচালী'কে অভিনন্দন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আধুনিক অনেক ভালো গল্প সম্বন্ধে আজও কোনো মত দিই নি—সেই অপরাধ হল নিবিড়—যথা বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালি।' নিতান্তই কুঁড়েমি করেই কিছু বলি নি, সে ওজর আজকে বেমানান হবে। ..পথের পাঁচালির আখ্যানটাও অত্যন্ত দেশী। কিন্তু কাছের জিনিষেরও অনেক পরিচয় বাকি থাকে। যেখানে আজন্মকাল আছি সেখানেও সব মানুষের সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না। পথের পাঁচালি যে বাংলা পাড়াগাঁয়ের কথা সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়। লেখার গুণ এই যে, নতুন জিনিষ ঝাপসা হয় নি, মনে হয় খুব খাঁটি, উঁচু দরের কথায় মন ভোলাবার জন্যে সস্তা দরের রাঙতার সাজ পরাবার চেষ্টা নেই। বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে। এই বইখানিতে পেয়েছি যথার্থ গল্পের স্বাদ। এর থেকে শিক্ষা হয় নি কিছুই, দেখা হয়েছে অনেক যা পূর্বে এমন করে দেখি নি। এই গল্পে গাছপালা পথ-

ঘাট মেয়েপুরুষ সুখদুঃখ সমস্তকে আমাদের আধুনিক অভিজ্ঞতার প্রাত্যহিক পরিবেষ্টনের থেকে দূরে প্রক্ষিপ্ত করে দেখানো হয়েছে। সাহিত্যে একটা নতুন জিনিষ পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিষের মতো সে সুস্পষ্ট।' (রোমান্স প্রসঙ্গে, পরিচয়, বৈশাখ ১৩৪০)।

বিভূতিভূষণের সাহিত্য পড়তে গিয়ে ঐ 'খাঁটি' কথাটা বারবার মনে পড়ে। সরল আন্তরিকতা তাঁর বিশিষ্ট গুণ।

'প্রাত্যহিক পরিবেষ্টনের থেকে দূরে প্রক্ষিপ্ত করে দেখানো'-র রীতিটা বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সত্য। এই projection-এর জন্যেই তার প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার বাস্তব কাহিনীও একটা রোমান্সের রঙ পায়। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে ডাঃ সুকুমার সেনও একথা বলেছেন।*

রবীন্দ্রনাথ 'রোমান্স-প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন চারুচন্দ্র দত্তের 'কৃষ্ণরাও' সমালোচনা করতে গিয়ে। তখন তিনি বলেছিলেন যে তাঁর লিখিত আলোচনার ভূমিকা 'কৃষ্ণরাও' ও 'পথের পাঁচালী' উভয় গ্রন্থ সম্পর্কেই প্রায় প্রযোজ্য। 'কৃষ্ণ রাও গল্পের যে ভূমিকা সেইটেই অল্প কিছু বদল করে ঐ বইয়েরও (অর্থাৎ পথের পাঁচালীর) ভূমিকা করা যেতে পারে।' ভূমিকার বক্তব্য এই যে উভয় গ্রন্থেই মন রোমান্স-রাজ্যে গিয়ে বেশ খানিকটা ছুটির রস পায়।

কিন্তু দুই বইয়ের রোমান্সের স্বাদে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে—সে কথাটা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন নি। 'পথের পাঁচালী'-তে নিকট

* 'এই গল্পে (পুঁই মাচা) এবং পথের পাঁচালিতে বিভূতিবাবুর রসকল্পনার স্বকীয়তা পরিস্ফুট। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখি পশ্চিম ও মধ্য বাংলার ধ্বংসপথবাহী পল্লীজীবনের অন্তঃক্রান্ত পরিবেশে দারিদ্র্য জর্জর মুমূর্ষু নরনারীর ক্রমবর্ধমান অভিভব। হিংস্র অরণ্য লতাগুল্মের বেড়াজালে জড়িয়া মানব জীবন যেন গুথাইয়া আসিতেছে। বোধহয় যেন জঙ্গলাকীর্ণ পোড়া ভিটার নিঃসঙ্গ বিভীষিকা মরণের ছায়া ফেলিয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে বাকি বসতিগুলি দখল করিতে। এই ধ্বংস-পথযাত্রার ছবি বিভূতিবাবুর রচনায় রোমাণ্টিক দূরত্বের প্রজেকটবের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। সুতরাং বিভূতিভূষণের দৃষ্টি অভিজ্ঞতাবদ্ধ হইলেও বাস্তব নয়, রোমাণ্টিক।' সুকুমার সেন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২০৭

দেশকালকে দূরে প্রক্ষিপ্ত করে দেখানো হয়েছে—স্মৃতির ফলকে ছবি দেখার মত; তাতে বিস্মৃতি মন থেকে অনেক কিছু হরণ করেছে কল্পনা অনেক কিছু পূরণ করেছে। চারুচন্দ্র দত্ত দূর দেশ কালকেই দেখেছেন 'কৃষ্ণরাও'-তে। তাকে দূরে প্রক্ষেপ করতে হয়নি, দূরে সে ছিলই। সেখানে 'তাঁর চোখে যা পড়ত সবইromance, কাব্য-ময়। পাঠককে সেই romance এর ভাগ দেবার ইচ্ছায়' তিনি গল্প লিখেছেন। (কৃষ্ণরাও, পৃঃ ৭৯)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাহিত্যাদর্শ

বিভূতিভূষণের সাহিত্যের খাসমহলে প্রবেশ করবার আগে তাঁর সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে তাঁর নিজের মুখ থেকেই কিছু শুনে নেওয়া ভাল। তাহলে ভিতর-মহলে আমাদের গতি অনেক সহজ হবে।

সাহিত্যের কতগুলি মৌলিক প্রশ্ন তাঁর মনেও জেগেছিল। অবশ্য এগুলি নিয়ে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেন নি। একটিমাত্র প্রবন্ধ এবং ডায়েরীগুলিতে দু'একটি বিক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত উক্তি ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই। ডায়েরীর মধ্যে তাঁর উপলব্ধির গভীর থেকে দু' একটি বাণী প্রকাশ পেয়েছে আকস্মিক বিদ্যুত-দীপ্তিতে। আর প্রবন্ধটিতে ('সাহিত্যের কথা') অনেকগুলি মূল প্রশ্নকে তিনি তুলেছেন, নিজে উত্তর দিয়েছেন। সে-উত্তর অতি সংক্ষিপ্ত ব'লে আফশোষ হ'তে পারে, কিন্তু আবার এই জন্যেই হয়তো তা অতিস্পষ্ট—কথার কুয়াসায় ধোঁয়াটে নয়।

বিভূতিভূষণ চাইতেন যে তাঁর সাহিত্য সর্বসাধারণে বুঝুক। কিন্তু এর জন্য তিনি তাঁর সাহিত্যিক মান-কে নিচের দিকে নামাবার পক্ষপাতী ছিলেন না, বরং শিক্ষা মারফৎ জনসাধারণকে উপর দিকে তুলতে চাইতেন। তিনি বলতেন, 'সাহিত্য ও শিল্পকে সর্বসাধারণের উপযুক্ত করে দাও—এই একটি আধুনিক ধুয়ার কোন মানে হয় না'। এ কথার অর্থ তো এই যে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রস অত্যন্ত ঘন, একে

খানিকটা জোলো করে দাও,—এর শিল্পের বুননীতে অত সূক্ষ্ম তন্তুর বদলে মোটা দড়ির ব্যবহার প্রচলিত কর। কারণ, তাহলে তখন শিক্ষা ও শক্তি নির্বিশেষে এ সাহিত্য যাবতীয় জনের হয়ে উঠবে, রসের মন্দিরে ভিড়ের আর কম্‌তি থাকবে না। আমাদের বক্তব্য এই যে, এ রকম কোন আদেশের উপর যদি জোর দেওয়া হয়, তবে সাহিত্যের সর্বনাশ করা হবে, এবং যাদের দিকে চেয়ে সাহিত্যে এই ভুয়ো গণতন্ত্রের সুর আমদানীর জন্য আমরা এ করতে যাব, তাদেরও শেষ পর্যন্ত উপকার কিছু হবে না। রস-সাহিত্যের উপভোগ-সামর্থ্যের দিক দিয়ে যারা 'হরিজন', সাহিত্যকেও জোর করে 'হরিজন'-মার্কা করে তাদের স্তরে না নামিয়ে উক্তরূপে তথাকথিত 'হরিজন'দর আর্ট ও সংস্কৃতিগত শিক্ষার এমন সুযোগ ও সাহায্য দিতে হবে, যাতে করে তারা মনের দিক দিয়ে ক্রমশঃ উঠে আসতে পারে, সূক্ষ্মতম রসের স্বাদ-গ্রহণে পারগ হয়।...সুতরাং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, সাহিত্যের যে একটি স্বাভাবিক আভিজাত্য আছে, এমন কিছু না করা যাতে তা একটুকু ক্ষুণ্ণ হয়, পরন্তু আমাদের সবাইকে তার উপযুক্ত হতে শিক্ষিত করা।'

সাহিত্যে প্রোপাগাণ্ডার স্থান সম্পর্কে তিনি মনে করতেন, আর্টের জাত নষ্ট না করে একটা বিশেষ সীমার মধ্যে থাকলে ক্ষতির কিছু নেই। 'সমাজ-সংস্কারই হোক, দেশপ্রেমই হোক, অথবা অন্য কোন সমস্যাদি সম্বন্ধে মতবাদই হোক, সব কিছুরই প্রোপাগাণ্ডা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ সীমার ভেতরে থেকে করা যেতে পারে, যদি তা তারপরও সাহিত্যই থাকে, কোন প্রচার-বিভাগের বিশদ চিত্তাকর্ষক প্যাম্ফ্‌লেটের মতন না হয়ে ওঠে। সাহিত্য ও আ জাত নষ্ট হয় তখনি, যখন এ অপরতর কোন উদ্দেশ্য সাধতে আপনার মূল সাধনা—অর্থাৎ সমসাময়িক সমস্যারও অতীত শাশ্ব-

সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রেরণা থেকে বিচ্যুত হয়। মনে রাখতে হবে স্বধর্ম ত্যাগ করা ভয়াবহ—অনেক কিছুর মত এক্ষেত্রেও।'

সাহিত্যের বিষয়বস্তু কি হবে?

'দুঃখবেদনা, হাসিঅশ্রু, সমস্যা-বিজড়িত অপরূপ মানুষের জীবন এবং জগৎ তার (অর্থাৎ সাহিত্যিকের) লেখার মালমসলা।'

অনেকের অভিযোগ তিনি শুনেছেন, 'আমাদের মত পরাধীন দরিদ্র দেশের সংকীর্ণ সমাজের মধ্যে কথা-সাহিত্যের উপাদান তেমন মেলে না।' এই 'খাড়া-বড়ি-থোড়ে'র অভিযোগ তিনি মেনে নেন নি। তিনি বলেছেন, 'এসব কথা মাত্র আংশিকভাবে সত্য। বাংলাদেশের সাহিত্যের উপাদান বাংলার নরনারী, তাদের দুঃখ-দারিদ্র্যময় জীবন, তাদের আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক—বহির্জগতের সঙ্গে তাদের রচিত ক্ষুদ্র জগতগুলির ঘাত-প্রতিঘাত, বাংলার ঋতুচক্র, বাংলার সন্ধ্যা-সকাল আকাশ-বাতাস, ফলফুল—বাঁশবনের, আমবাগানের নিভৃত ছায়ায় ঝরা সজনে ফুলবিছানো পথের ধারে যে সব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে—তাদের কথাই বলতে হবে, তাদের সে গোপন সুখদুঃখকে রূপ দিতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে জীবন-সংযোগহীন সাহিত্যকে ধিক্কার দিয়েছেন: 'যে-সাহিত্য টবের ফুল—দেশের সত্যিকার মাটিতে শিকড় চালিয়ে যা রস-সঞ্চয় করছে না, দেশের লক্ষ লক্ষ মূক নরনারীর আশা-আকাঙ্খা দুঃখ-বেদনা যাতে বাণী খুঁজে পেল না, তা হয় রক্তহীন, পাণ্ডুর, থাইসিসের রোগীর মত জীবনের বরে বঞ্চিত, নয়তো সংসার-বিরাগী ঊর্দ্ধবাহু, মৌনী, যোগীর মত সাধারণ সাংসারিক জীবনাস্তে বাইরে অবস্থিত।'

অবাস্তব মিথ্যাশ্রয়ী সাহিত্যকে বলেছেন মূল্যহীন: 'মিথ্যাকে আশ্রয় কথাসাহিত্যিক রসসৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু সে হয় মানুষকে ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়ে রাখবার সাহিত্য—সমাজের ও জীবনের সত্য

চিত্র হিসেবে তার মূল্য কিছু থাকে না।'

সত্যিকার সাহিত্যিক যিনি, 'চারিপাশের মানব-সমাজ সম্বন্ধে তিনি শুধু চিন্তা করেন এই নয়, এর অন্তরতম হৃদয়-স্পন্দনকে তিনি একান্তভাবে অনুভবের চেষ্টা পান।'

সাহিত্যিককে তাই উন্নাসিকের মত সাধারণ মানুষের গায়ের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চললে হবে না। 'গভীর রহস্যময় এই মানব-জীবন। এর সকল বাস্তবতাকে এক বহুবিচিত্র সম্ভাব্যতাকে রূপ দেওয়ার ভার নিতে হবে কথাশিল্পীকে। তাকে বাস করতে হবে সেখানে, মানুষের হট্টগোল, কলকোলাহল যেখানে বেশী, মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের সুখদুঃখকে বুঝতে হবে।' আর এর জন্যে লেখকদের চাই কেবল 'মানুষের প্রতি সহানুভূতি, তাকে বুঝবার ধৈর্য।'

কিন্তু 'মানুষের হট্টগোল'-এর মধ্যে বাস করলেও সাহিত্য-সৃষ্টির কার্যটি মানসিক, লেখক সেখানে একক, নিঃসঙ্গ, হাটের মাঝে দাঁড়িয়ে করবার নয় এ কাজ। 'সাহিত্য যদিও সর্বসাধারণের মধ্যে আন্তরিকতম মিলনের যোগসূত্রস্বরূপ, এবং যদিও চারিপাশের মানুষকে বাদ দিয়ে এখানে কোন সৃষ্টি সার্থক হওয়া দূরে থাক প্রায় সম্ভবই নয়,—তবুও সাহিত্য-সৃষ্টি লোকালয়ের হাটের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে করবার নয়।'

'সুতরাং সকলেরই সঙ্গে আপনাকে নিরন্তর যুক্ত রেখে তার সাধনা। তবুও, মনের দিক দিয়ে তার পক্ষে চরম একাকীত্ব একটি প্রকাণ্ড সত্য—অপরিহার্য এবং প্রয়োজনীয়ও। 'রিয়্যালিটি'কে বুঝতে হলে, বা বুঝে তাকে যথাযথ আঁকতে হলে তাতে জড়িয়ে গিয়ে আমরা তা পারি না—কর্মকোলাহলের ঠিক মাঝখানে অথবা লোকলোচনের অত্যন্ত স্পষ্ট পাদপ্রদীপের সামনে অনুক্ষণ থেকে আমরা তা পারি না।'

লেখক লেখেন কার জন্যে?

'কবি সাহিত্যিক আপনার জন্য লেখেন, সে হচ্ছে তার আত্ম-

প্রকাশ, অস্তিত্বের সেই একমাত্র রূপের মধ্য দিয়ে তিনি আপনাকে উপলব্ধি করেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি সকলেরই জন্য লেখেন।'

সাহিত্য-পাঠে পাঠকের কি লাভ ?

সাহিত্য পাঠকের 'আত্মসত্তার...বিস্তারের সম্ভাবনা'-কে 'অত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে সহায়তা করে', স্বপ্নপ্রবণতার তৃপ্তি ঘটায়, কৌতূহল চরিতার্থ করে এবং শক্তি যোগায়।

'প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কম-বেশী পরিমাণে একটি মানুষ আছে, যে নাকি স্বপ্ন দেখে, যে নাকি অন্ততঃ কোন কোন ক্ষণের জন্যও আদর্শবাদের তীব্র প্রেরণা অনুভব করে, যে অতীত-স্মৃতির অনুধ্যানে সহসা উন্মনা হয়, ভবিষ্যতের কল্পনায় নেশার মতন হয় আসক্ত, রস-সাহিত্যের একটি প্রধানতম কাজ হচ্ছে, প্রত্যেকের ভেতরকার এই স্বপ্নালু লোকটির তৃপ্তিবিধান করা। তা ছাড়া,—কথা সাহিত্যিক সমসাময়িক সমাজ বা রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশ-কালান্তরিত জীবনের ছবি আঁকেন। তাতে করে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে মানুষটি তার নিজ যুগের মানুষ আর ঘটনাবলী সম্বন্ধে খুব উৎসুক তার কৌতূহল মেটে। সাহিত্য আমাদের কল্পনা ও অনুভববৃত্তিকে উজ্জীবিত করে। এর মননশীল দিক প্রধানতঃ জীবন-সংগ্রামে ও সভ্যতার সংগঠনে আমাদের শক্তি যোগায়।'

গভীর রহস্যময় মানবজীবনের বাস্তবতাকে তিনি সাহিত্যের উপজীব্য মনে করতেন। তাঁর কাছে এই বাস্তবতার সংজ্ঞা কি, তা তিনি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন, আগেই তা উদ্ধৃত করেছি আমরা। এই সংজ্ঞাকে তিনি আবার খানিকটা সীমাবদ্ধও করেছেন —নগ্ন চিত্র বা করাল চিত্রকে তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বীকার

করতে পারেন নি। 'ফ্লবেয়ার বলেছে, মানুষে যা করে, যা কিছু ভাবে, সবই সাহিত্যের উপাদান, তাই তাকে লিখতে হবে, শোভনতার খাতিরে তিনি যদি জীবনের কোন ঘটনাকে বাদ দেন, চরিত্রের কোন দিক ঢেকে রেখে অঙ্কিত চরিত্রকে মাধুর্যমণ্ডিত বা শ্রেষ্ঠ করবার চেষ্টা করেন—ছবি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 'এমা বোভারি'-র স্রষ্টার উপযুক্ত কথা বটে! কিন্তু এই বাস্তবতার কি একটা সীমা নেই? জীবনের নগ্ন চিত্র—দিগ্বসনা ভীমা ভয়ঙ্করী ভৈরবীর মত করাল—সে চিত্র মানুষের মনে ভয় সঞ্চার করে, অবসাদ আনে, জুগুপ্সার উদ্রেক করে—সাধারণ রসবিলাসী পাঠকের সাধ্য নয় সে কঠিন নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখীন হওয়া। সূর্যের অনাবৃত তাপ পৃথিবীর মানুষে সহ্য করতে পারে না, তাই বহু মাইলব্যাপী বায়ুমণ্ডলের আবরণের মধ্য দিয়ে তা পরিস্রুত হয়ে, মোলায়েম হয়ে তবে আমাদের গৃহ-অঙ্গনে পতিত হয় বলে রৌদ্র আমাদের উপভোগ্য, প্রাণীকুলের উপজীব্য। সে আবরণ দেবেন শিল্পী তাঁর রচনায়। নির্বাচনের স্বাধীনতা তিনি ব্যবহার করবেন শিল্পীর সংযম ও দৃষ্টি নিয়ে।')

তিনি স্বীকার করেছেন, 'সঙ্কীর্ণ অর্থে নৈতিকতার মানদণ্ড সাহিত্যের প্রতি প্রয়োগ করা যায় না অবশ্য…।' কিন্তু 'কি জীবনে কি সাহিত্যে—শক্তি ও প্রতিভার সঙ্গে প্রেম ও সত্যবুদ্ধি যুক্ত না হলে স্থায়ী কিছুর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। সমাজের প্রচলিত নীতি-প্রথাকে সাহিত্যিক নির্মম আঘাত করতে পারেন, কিন্তু শুধু সত্যের জন্যই পারেন, ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য নয়। সাহিত্যিক বাস্তব জগতের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তার চিত্র আঁকবেন। কিন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যথেষ্ট পরিষ্কার হলে তিনি দেখবেন যে বাইরের জগতে যা ঘটে, তার চেয়ে লেখকের মনের জগতে আর এক মহত্তর ব্যঞ্জনাময় বাস্তব আছে; এবং, যদিও মানুষের জীবন এত বিচিত্র ও মোহনীয়রূপে জটিল, কারণ পাপ দুর্বলতা পদস্খলনের কাহিনী তার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, তবুও

সে যেখানে বড়, সেখানে তার রূপ কেবলএ ই-ই নয়। তাছাড়া, বৃহত্তর অর্থে নীতিবোধ, জীবন ও সমাজের মূল সত্তার সঙ্গে জড়িত; সাহিত্য থেকে তাকে কি আমরা বিচ্ছিন্ন করতে পারি!'

এই উদ্ধৃতির একটি লক্ষণীয় লাইন হচ্ছে: 'বাইরের জগতে যা ঘটে, তার চেয়ে লেখকের মনের জগতে আর এক বৃহত্তর ব্যঞ্জনাময় বাস্তব আছে।' এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যেই তাঁর সাহিত্যে 'বাইরের জগতে'র বাস্তবতা যেমন বিশদভাবেই আছে, তেমনি তাতে মনের রং-ও কম লাগে নি। কারণ মনের জগতের বাস্তবকে তিনি মহত্তর ব্যঞ্জনাময় মনে করতেন। এই মনের জগতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বলেই 'জীবনের নগ্ন চিত্র' বা 'দিগ্বসনা ভীমা ভঙ্করী ভৈরবীর মত করাল' বাস্তবকে তিনি এড়িয়ে গেছেন, প্রকৃতির রুদ্র মূর্ত্তিকে তিনি দেখতে চাননি। জীবনে বোধ হয় একটিও 'ভিলেন' তিনি আঁকেননি। চরিত্র স্থষ্টির ক্ষেত্রেও তিনি একদেশদর্শী।

'নিরাসক্ত আনন্দে' স্থষ্টি করা সাহিত্যিকের কর্তব্য, তিনি বলেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের সাহিত্যের মধ্যেই তাঁর নিজের আসক্তির ছাপ পড়েছে। সাহিত্যস্থষ্টির ক্ষেত্রে তিনি detached নন। নগ্ন ও করাল বাস্তবের দিক থেকে মুখ ফেরাতে গিয়ে মানুষের জীবন-সংগ্রামের দিক থেকেও তাঁর চোখ যেন অনেকটা সরে গিয়েছে; অথচ তিনি নিজেই মনে করতেন যে সাহিত্যের 'মননশীল দিক প্রধানতঃ জীবন-সংগ্রামে ও সভ্যতার সংগঠনে আমাদের শক্তি যোগায়।' উপন্যাস ও গল্পকে তিনি কি 'মননশীল' সাহিত্য মনে করতেন না? 'মননশীল' সাহিত্য ও 'রস-সাহিত্য'-কে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দুটি শ্রেণী হিসাবে দেখবার ফলেই কি এমনটা ঘটেছে? যাই হোক, জীবন-সংগ্রামে ব্যর্থ মানুষের' জন্য তিনি অনেক সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন, কেঁদেছেন, কিন্তু 'জীবনসংগ্রামে ও সভ্যতার সংগঠনে আমাদের শক্তি যোগায়' যে সাহিত্য তা রচনা করবার দিকে তত ঝোঁকেননি।

'নির্বাচনের স্বাধীনতা' তাঁকে মাধুর্যের ও কারুণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে।

'মনের জগত' ও 'বাইরের জগত'-এর দ্বন্দ্ব তাঁর মধ্যে একেবারে ছিল না তা নয়। কিন্তু এই দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে 'মনের জগত'-এর উপর সমস্তটা ওজন রাখার দিকে ঝোঁক ছিল তাঁর সচেতন মনে। তিনি বলেছেন, 'সাহিত্য শিল্পীদের জীবনের প্রতিবিম্ব।' কিন্তু এই সঙ্গে সাহিত্যকে তিনি জীবনের প্রতিবিম্ব বলেননি। তিনি উক্তিটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'প্রত্যেক লোকই তার নিজের অনুভূতি লেখবার অধিকারী। ফুল, ফল, লতা, পাখী, সমুদ্র, মা-বাপ, ছেলে মেয়ে সব আছেই—আমি তাদের কি রকম দেখলাম সেইটাই আসল কথা। জীবনটাকে আমি কি রকম পেলাম, সেইটাই সকলে জানতে চায়।' (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ৪১)। 'কি রকম দেখলাম' এটাই তাঁর কাছে আসল, 'কি দেখলাম'-এর ঠাঁই নেই। অবশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে 'কি রকম দেখলাম'-কে একেবারে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়, যত বস্তুনিষ্ঠ রচনাই হোক না কেন, তার মধ্যে সূক্ষ্ম বা প্রচ্ছন্নভাবে সেটা থাকে, কিন্তু এটাই যখন সব হয়ে দাঁড়ায়, তখন সাহিত্য 'নিজের অনুভূতি'র মধ্যে বন্দী হ'য়ে আত্মমুখিতার আতিশয্যে আক্রান্ত হয়।

'সাহিত্য শুধু জগতটাকে কে কি চোখে দেখেছে তারই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী।' (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ৪১)। বিভূতিভূষণ এই কথা বলেছেন উপরের উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। কিন্তু কি চোখে দেখেছে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী মাত্রই সাহিত্য নয়, সামাজিক মনের 'সহিত-ত্ব' পেতে হবে তাকে, রসানুভূতি জাগাতে হবে পাঠকের মনে। অভিজ্ঞতা যদি একান্তই 'ব্যক্তিগত' হয়ে নিজের অনুভূতি-র চার দেওয়ালের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে, তবে তা সামাজিক মনে বিশেষ আবেদন জাগাতে পারে না।

এমন কি চরিত্রের ক্ষেত্রেও তিনি মনে করেন, 'বর্ণিত নায়ক-নায়িকার পিছনে শিল্পী তার আবাল্য-দীর্ঘ জীবনের সকল সুখদুঃখ, হাসিকান্না নিয়ে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন। কল্পনাও কিছু না কিছু অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে তবে শূন্যে ভর করে—যেমন সনেটের পিছনে তেমনি হ্যামলেটের পিছনে সেকস্‌পিয়র গুপ্ত থেকেও ধরা দিয়েছেন।' (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ৪১)।

সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিপ্রক্ষেপ থাকে ঠিকই, কিন্তু তার মাত্রাধিক্য উপন্যাস বা নাটকের গুণ নয়। হ্যামলেটে শেকস্‌পীয়রের ব্যক্তি-প্রক্ষেপ কতখানি হয়েছে বিতর্কের বিষয়, কিন্তু একথা সর্বজনজ্ঞাত যে শেকসপীয়রের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব বিভিন্ন ধরণের চরিত্রের যথাযথ রূপায়ন; হাজার চরিত্র সেখানে ঠিক হাজারটা আলাদা মানুষের মতই এসেছে। নাম মুছে দিলেও পরস্পর গুলিয়ে-মিশিয়ে যাবার আশঙ্কা নেই। সে আশঙ্কা আছে বিভূতি-ভূষণের সাহিত্যে। তাঁর নায়করা নামেই আলাদা—সকল নামের অন্তরালে একটিমাত্র মানুষের পদধ্বনি নিঃসংশয়িতভাবে শোনা যায়—সেই মানুষটির নাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। *

* এই অধ্যায়ের উক্‌তিগুলি বিভূতিভূষণের 'সাহিত্যের কথা' প্রবন্ধ থেকে সংকলিত। তিনটি উক্‌তি আছে 'স্মৃতির রেখা' থেকে—সেগুলি যথাস্থানে উল্লেখ করা আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

শিল্পীমানস

॥ এক ॥

॥ নির্জন দেশপ্রেমিক ॥

বিভূতিভূষণ তাঁর কালের নির্জনতম ঔপন্যাসিক। 'নির্জন' শব্দটা জীবনানন্দের সঙ্গে বড় জড়িয়ে গেছে। শব্দটা দেখলেই এখন জীবনানন্দকে মনে পড়ে। এই একচেটে বিশেষণটা থেকে জীবনানন্দের একাধিপত্য যদি খর্ব হয়, তবে তার জন্যে দুঃখ করবার দরকার নেই। বিভূতিভূষণের সমসাময়িক ঔপন্যাসিকরা যখন জীবনের কোলাহলে মুখর, তখন তিনি সেই সাহিত্যসভার একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে একটি স্নিগ্ধ নিভৃত সুরের আলাপ করেছেন।

গ্রাম-বাংলাকে দেহ-মনের যুক্ত অঞ্জলিতে গ্রহণ করেছিলেন বিভূতিভূষণ। ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জেলে দেখেছিলেন তার রূপ, বরণ করে মনের ঘরে তুলেছিলেন, সাহিত্যের সভায় গেয়েছিলেন তার গান। এইখানেই তাঁর দেশ-প্রেমিকতা। দেশকে তিনি 'মা, মা' বলে উচ্চকণ্ঠে ডাকেন নি, তার সঙ্গে মিশে ছিলেন তিনি।

তাঁর প্রেমিকতা সরবে ঘোষিত নয়, কর্মে সক্রিয় নয়, অনুভূতিতে মাত্র সজীব। মৃদু কলভাষে বাংলার মাটীর এমন জয়গান আর কোন ঔপন্যাসিক করেন নি। তার লতাপাতা, গাছপালা, ঐ যে মাটীর সোঁদা গন্ধটুকু, কিছুই তাঁর কাছে অপাঙ্‌ক্তেয় নয়, অবান্তর নয়। এখানকার ধূলোমাটি গায়ে মেখে তাঁর তৃপ্তি। তাঁর সাহিত্যের পাতায় পাতায় সেই ধূলোমাটির শ্যামলতা, সেই তৃপ্তির রোমন্থন।

শুধু এই গ্রাম-বাংলা নয়, 'অপরাজিত' 'আরণ্যক' প্রভৃতিতে

এই পটভূমি আরো বিস্তৃত। অরণ্য-ভারত তার পরিধি-ভুক্ত। বাংলার সাহিত্য নতুন দিগন্ত লাভ করল বিভূতিভূষণের হাতে। শেষ গ্রন্থ 'কুশল পাহাড়ী' পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যে অগণ্য আরণ্যের পদধ্বনি।

এই বিস্তার তাঁর হৃদয়ের প্রসারেরই স্বাক্ষর বহন করছে। শিক্ষিত-সুলভ অভিমানে তিনি এদের পিঠ চাপড়ান নি, উপদেশ-বৃষ্টি করেন নি। এদের অন্তরের ঐশ্বর্যকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন আন্তরিক প্রীতি দিয়ে, এবং সৌভাগ্যের কথা, তিনি ব্যর্থ হন নি। (অরণ্যের সৌন্দর্য ও অরণ্যমানবের সৌন্দর্য তাঁর অনুসন্ধেয়, তাঁর আনন্দ। বর্ত্তমান সভ্যতার থাবা যেখানে এই সৌন্দর্যকে করেছে ক্ষত-লাঞ্ছিত, সেখানে তিনি আর্ত হাহাকারে বলে উঠেছেন, 'ন হন্তব্যো, ন হন্তবঃ'। এই আঘাত তাঁকে সময় সময় এত বিচলিত করেছে যে তিনি সমগ্র সভ্যতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চেয়েছেন—বিশেষত শিল্প-সভ্যতার দিক থেকে। জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্য-কলা যে-সভ্যতা দান করেছে তাকে তিনি চান, কিন্তু যে সভ্যতা মাটিকে দিয়েছে নোংরা ঘিঞ্জি বস্তী, আকাশকে করেছে চিমনীর ধোঁয়ায় কালো, আর মানুষকে অন্তর-বাহিরের সরল সৎ সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে কুরূপ, তার প্রতি তাঁর মানসিক বিরূপতা সীমাহীন। এই বিরূপতা তাঁর এত বেশী যে তিনি আশা করেছেন, একদিন অরণ্য তার আজকের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে সভ্যতার ওপর।

'মানুষ প্রকৃতির এই মুক্ত সৌন্দর্যকে ধ্বংস করিতেছে সত্য, গাছপালাকে দূর করিয়া দিতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি একদিন প্রতিশোধ লইবে। ট্রপিক্স্-এর অরণ্য আবার জাগিবে, মানুষকে তাহারা তাড়াইবে, আদিম অরণ্যানী আবার ফিরিবে। ধরা-বিদ্রাবণকারী সভ্যতাদর্পী মানুষ যে স্থানে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে, পর্বতমালার নাম দিয়াছে নিজের দেশের রাজার নামে, হ্রদের নাম দিয়াছে রাজমন্ত্রীর নামে; ওর শুশুক, পাখী, শিল, বগলা হরিণ, ভালুককে খুন করিয়াছে তেল, বসা, চামড়ার লোভে,

ওর মহিমময় পাইন অরণ্য ধূলিসাৎ করিয়া কাঠের কারখানা খুলিয়াছে, এ সবের প্রতিশোধ একদিন আসিবে।' (অপরাজিত, পৃঃ ৩১৩)।

অতিরিক্ত লোভ নিশ্চয়ই অকাম্য। কিন্তু সভ্যতার রথ একদম তেল-বসা-চামড়া-কাঠ ছাড়া কি করে চলবে! সে-চিন্তা বিভূতিভূষণ করতে চান না, সভ্যতাকে তার সৌন্দর্যগ্রাসী ভয়াবহতা থেকে মুক্ত করে সৌন্দর্যের সঙ্গে পরিণীত কি ভাবে করা যায়, সে সম্পর্কে তিনি মাথা ঘামাতে চান না। সৌন্দর্যপ্রাণ লেখক সৌন্দর্যের বিন্দুমাত্র লোকসান দেখলেই ভাবাবেগে এত বিচলিত হন যে তখন যুক্তিচালিত চিন্তা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

শুধু ঐ বিশেষ মুহূর্তগুলিতেই নয়, কোন সময়েই তিনি মনন-বিশ্লেষণে আগ্রহী নন। কারণ তাঁর মতে বিস্ময়টা 'mother of philosophy' নয়, বিস্ময়ই ফিলসফি, বাকীটা তার অর্থসঙ্গতি মাত্র। ('অপরাজিত' দ্রষ্টব্য)। তিনি কোন ঘটনারই অর্থসঙ্গতি করতে চান না চিন্তাজগতে, তিনি শুধু বিস্ময়রসকে আকণ্ঠ পান করতে চান। আর সে পান-উপভোগে বাধা পড়লেই তিনি শিশুর মত অযৌক্তিক বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। আর বিভূতিভূষণের অভিশাপ-বাণী উচ্চারণের ভঙ্গি দেখে মনে হয় যে আগামী সভ্যতা-অরণ্য সংঘর্ষে অরণ্য সভ্যতাকে সমুচিত শাস্তি দিলেও বিভূতিভূষণকে সে রেহাই দেবে যেন, সে জানে যে বিভূতিভূষণ অরণ্যকে ভালবাসেন। যত অনুরাগই তাঁর অরণ্যের প্রতি থাক, উক্ত সংঘাতে যে তিনি মানব-সভ্যতার স্বপক্ষে নিয়তি-নির্দিষ্ট, তা ভুলে যান বিভূতিভূষণ। আর সৌন্দর্যগ্রাসী মানবসভ্যতাকে শাসাতে থাকেন এই বলে যে অরণ্যের শক্তি "বিপুল, বিশাল, বিরাট। অসীম ধৈর্যের ও গাম্ভীর্যের সহিত সে সংহত শক্তিতে চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতেছে, কারণ সে জানে তাহার নিজ শক্তির বিপুলতা।...ঐ শক্তিটা ধীরভাবে শুধু সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে মাত্র।" (অপরাজিত, পৃঃ ৩১৪)।

অবশ্য এ থেকে এমন সিদ্ধান্তে আসা ঠিক নয় যে মানবপ্রীতি তাঁর ছিল না। সভ্যতার বলদর্পী নিষ্ঠুর, লোভী, সৌন্দর্য-সংহারক মূর্তিকে তিনি অভিশাপ দিয়েছেন। মানুষের জটিলতা, লোভ, উচ্চাশা, নির্মমতার প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক বিরাগ। ভালবাসতেন তিনি গ্রামীণ ও আরণ্য মানুষ, যারা মনে-মুখে এক, জীবন-আচরণে সৎ ও সরল, মনোজীবনে ভাবুক। তাঁর সাহিত্যে এদেরই জয়গান। বিভূতিভূষণের প্রকৃতিজগৎ শুধু গাছ-পাখী-মাটি নিয়ে নয়, এই মানুষরাও তার অংশ। মানুষ তাঁর প্রকৃতি জগৎ থেকে নির্বাসিত নয়, জৈব-সূত্রে যুক্ত। তার মানুষ শ্যামল-সুন্দর প্রকৃতি-পরিবারের অন্যতম সদস্য।

দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি এই প্রীতির জন্যই তাকে বলেছি 'দেশপ্রেমিক'। শব্দটা অতি ব্যবহৃত, কিন্তু এখানে ব্যবহারটা ধরা-বাঁধা অর্থে নয়, তা আগের আলোচনায় স্পষ্ট। তবু এ শব্দটি গ্রহণের কারণ আছে। কেউ কেউ মনে করেন, বিভূতিভূষণে দেশপ্রেম অনুপস্থিত; কারণ হয়ত তার রাজনৈতিক সাহিত্যের অভাব। এই ভুল ধারণার বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত থাক 'দেশপ্রেমিক' শব্দটি। তবে তাঁর ভালবাসা ভাবুকের ভালবাসা, কর্মবীর বা চিন্তাবীরের ভালবাসা নয়। তাঁর প্রেম নিষ্ক্রিয়, সক্রিয়তায় উদ্বুদ্ধ নয়। তিনি দেশের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না—কোন সমস্যাতেই বিশেষ মাথা দিতেন না। প্রত্যক্ষ রাজনীতি করেন নি, দেশ-সমস্যার আলোচনা করে উপন্যাস লেখেন নি। তবু আমরা যেন ভুলে না যাই যে অতি-সাধারণ মানুষ যা ছিল আমাদের আশেপাশে অথচ চোখ এড়িয়ে যাচ্ছিল, এই দেশেরই অতি-সাধারণ সৌন্দর্য, যা ছিল আমাদের দাওয়ার পাশে অবহেলিত, তাদের স্বীকৃতি দান করেছিলেন তিনি।

মানুষের জীবনসংগ্রামের সক্রিয় রূপ তাঁর চোখে পড়ে নি। তিনি দেখেছেন মানুষের সততা সরলতা; এইটে তাঁর মনের

তারে সুর তুলেছে, একেই তিনি বড় করে বাজিয়েছেন।

তাঁর মনে কোন রকমের রৌদ্র সুরই বাজত না। তাঁর সাহিত্যে শিব ধ্যানস্থ ও তন্ময়, প্রলয়-নৃত্যশিল্পী নয়। এইখানে তাঁর সীমাবদ্ধতা। মনের সঙ্গে সুর-মেলানো জগৎ তাঁর। বহু আছে তাতে, বিচিত্র নেই। বৈচিত্রের অসম সুরের সাধনা তাঁর নয়, বহুর সুর সাম্য তাঁর কাম্য ও আয়ত্তাধীন, সুরের এই এককতায় তিনি আত্মহারা এবং সীমিত, আত্মস্থ ও নির্জন।*

যদিও তিনি বলেছেন, 'এই যুগে জন্মে আমি সকল রকম বিচিত্র জীবন-ধারার অভিজ্ঞতা চয়ন করে তার কাহিনী লিখে রেখে যাব।" (স্মৃতির রেখা, পৃ ৪১), কিন্তু তাঁর সাহিত্য-সাক্ষ্যে বলা যায় যে যুগের বিচিত্র জীবনধারার সাধনা তিনি করেন নি। তিনি এর পরের পাতাতেই (পৃঃ ৪২) বলছেন, 'আমি সেই জগতে ডুবে থাকত চাই—সেটা আমারই কল্পনায় গড়া আমারই নিজস্ব জগৎ, আমার চিন্তা, শিক্ষা, কল্পনা, স্মৃতি সব উপকরণে গড়া।"

বাস্তবের বিচিত্র জীবন ধারা ও কল্পনার নিজস্ব জগৎ—এই দুয়ের দ্বন্দ্বকে তিনি এড়িয়েছেন বিশেষ কৌশলে। কাহিনীর কাঠামো তিনি নিখুঁত বাস্তব থেকে আহরণ ক'রে তার ওপরে নিজের স্বপ্নজগৎ গড়ে তোলেন। নিয়ত দেখা অতি-পরিচিত জগৎ-সংসারের ভিত্তি-ভূমিতে 'রূপকথা'-র সৌধ রচনা করতেন তিনি। তাঁর বাস্তব ঘরে তাই 'খেলাঘর'-এর স্বাদ।

* নির্জনতাকে তিনি চাইতেন 'as a bride'। তৃণাঙ্কুরে (পৃঃ ১২১) লিখেছেন, "এমার্সন বলেচেন, 'Every literary man should embrace solitude as a bride। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হিউ ওয়ালপোল…বড় চমৎকার একটা প্রবন্ধ লিখেচেন। নির্বাসিত দান্তে বলেছিলেন, 'কি গ্রাহ্য করি আমি, যতক্ষণ আমার মাথার ওপর আছে নীল আকাশ আর অগণ্য তারকালোক'। জার্মান মিষ্টিক একহার্ট কখনো লোকের ভিড়ে বা শহরের মধ্যে থাকতে ভালবাসতেন না"—

বিভূতিভূষণের দ্বন্দ্ব-ভীরু মন প্রায় সর্বত্রই দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে গেছে। কেবল একটি মাত্র গ্রন্থে—আরণ্যকে—তাঁর স্বপ্ন ও বাস্তব এক অনিবার্য সংঘাতের বেদনায় ট্র্যাজিক মহিমা লাভ করেছে। অন্য কোন যায়গাই তিনি ট্রাজেডির লেখক নন, লিরিকের কবি। শুধু এই 'আরণ্যকে' লিরিক-প্রবণতার অন্তরালে এক সূক্ষ্ম ট্র্যাজিক ক্রন্দনের প্রবাহ।

॥ দুই ॥

॥ "আরণ্যক" ॥

'আরণ্যক' শুধু প্রকৃতিপ্রীতির ইতিকথা নয়, অসংলগ্ন চিত্রের প্রদর্শনী নয়। এ সবের আড়ালে একটা অন্তর্বেদনা ফল্গুস্রোতে প্রবাহিত। সেই স্রোতেই 'আরণ্যক'-এর সত্যকার পরিচয়।

গ্রন্থের সুরুতে লেখক বলেছেন, "আমার এ-স্মৃতি আনন্দের নয়, দুঃখের। এই স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির লীলাভূমি আমার হাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল, বনের দেবতারা সেজন্য আমায় কখনও ক্ষমা করিবেন না জানি। নিজের অপরাধের কথা নিজের মুখে বলিলে অপরাধের ভার শুনিয়াছি লঘু হইয়া যায়।" এই অনুতাপের সুরে সমগ্র উপন্যাসটি বিধৃত।

এ বইয়ের মূল চরিত্র দুটি, অরণ্য ও 'আমি'। বইয়ের সুরুতে দুয়ের সাক্ষাৎ—দুই অপরিচিতের আনুষ্ঠানিক পরিচয়; শেষে একের মৃত্যুর মধ্যে উভয়ের চিরবিচ্ছেদ। অরণ্যের প্রতি এই উত্তমপুরুষটির দৃষ্টি প্রথমে অপ্রসন্ন, তাঁর নির্বাসন-নিঃসঙ্গ নয়নে আরণ্য মোহাঞ্জনের ছোঁয়া তখনও লাগে নি। অরণ্য ছেড়ে কোলকাতায় ফেরবার জন্য মন সব সময় পালাই-পালাই করে। পলায়ন-উন্মুখ মনটিকে গোমস্তা গোষ্ঠ সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে—থাকুন দু'দিন শেষে এ ছেড়ে যেতে মন চাইবে না।

ভবিষ্যৎ প্রেমের ইঙ্গিত দিয়েছে গোষ্ঠ গোমস্তা। কিন্তু নায়ক (তথা লেখক) তো বৈরী-সম্পর্কে আগত—অরণ্যের মৃত্যুর কুঠার হাতে নিয়েই এই পরশুরামের আবির্ভাব। অরণ্য পৃথিবীকে নির্বৃক্ষ করাই তাঁর কর্তব্য। সেই মৃত্যুদণ্ড দ্রুত সুসম্পূর্ণ ক'রে তিনি চলে যাবেন, এবং ভেবেছিলেন, হৃদয়ের প্রান্তে বিন্দুমাত্র চিহ্নও থাকবে না এ ঘটনার।

কিন্তু নায়কের নিঃসঙ্গতার শূন্য পেয়ালা অরণ্য ক্রমে পূর্ণ করে তুলতে লাগল, নেশা ধরতে শুরু করল তাঁর। জ্যোৎস্না-রংয়ের শাড়ী পরে মাঠ ও কাশবনের উপর কে যেন এসে দাঁড়াল, নতুন-ফসল-তোলা খামারের মধ্যে পাওয়া গেল তারই দেহের সুগন্ধ, সরস্বতীকুণ্ডের কবরীতে ফুটে উঠল বিচিত্র-বর্ণ পুষ্পরাজি। প্রেমের বাঁধন পড়ল। আর তাই নায়কের হাতের প্রতিটি কুঠারাঘাত দ্বিগুণিত হয়ে তাঁর নিজের বুকেই ফিরে আসতে লাগল। কিন্তু থামবার উপায় নেই। 'আমি' যে ঐ বিশেষ ক্ষেত্রে মহাকালের দূত, অগ্রসরমান সভ্যতার প্রতিনিধি। যত বেদনাই বাজুক, হাত থেকে কুঠার নামাবার উপায় নেই।

'প্রকৃতির নিজের হাতে সাজানো তার শত বৎসরের সাধনার ফল এই নাঢ়া-বইহার, অতুলনীয় বন্য সৌন্দর্য ও দূরবিসর্পিত প্রান্তর লইয়া বেমালুম অন্তর্হিত হইবে। অথচ কি পাওয়া যাইবে তাহার বদলে? কতকগুলি খোলার চালের বিশ্রী ঘর, গোয়াল, মকাই, জনারের ক্ষেত, শোণের গাদা, দড়ির চারপাই, হনুমানজীর ধ্বজা, ফণিমনসার গাছ, যথেষ্ট দোক্তা, যথেষ্ট খৈনী, যথেষ্ট কলেরা ও বসন্তের মড়ক।" এত সব জেনেশুনেও এ কাজটা করতে হবে নিজে হাতে।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সৌন্দর্য রক্ষা ও বৃদ্ধির কিভাবে সঙ্গতি হতে পারে, এমন কোন পজিটিভ্ ভাবনার দিকে বিভূতিভূষণের মন যেতে চায় না। তিনি সভ্যতার মড়ক ও কুশ্রীতা দেখে মুখ ফেরাতে চান। সভ্যতার দেহ থেকে ব্যাধিগুলিকে মুক্ত করার উপায় ভাবতে চান না। তাই সভ্যতার অনিবার্য দাবীতে অরণ্য যখন শস্যক্ষেত্র এবং শিল্পের জন্য জমি ছেড়ে দেয়, তখন প্রকৃতি-সৌন্দর্য ও মানব সরলতার জন্য তিনি হাহাকার করেন, অথচ কুঠার সংযত করতেও পারেন না। অরণ্যের পায়ের কাছে রাখেন ব্যথিত অনুতপ্ত হৃদয়ের একটি ক্ষমা প্রার্থনার প্রণাম, 'হে অরণ্য, হে সুপ্রাচীন, আমায় ক্ষমা করিও।'

॥ তিন ॥

॥ জীবনবোধ ॥

বিশ-শতকের দ্বিতীয় পাদ বিভূতিভূষণের কার্যকাল। এই সময়ের বৃহৎ ঘটনা—অর্থনৈতিক মন্দা, মধ্যবিত্ত জীবনে সমস্যার প্রসার, উত্তুঙ্গ রাজনৈতিক আন্দোলন, বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ প্রাণক্ষয়ী দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব, দেশবিভাগ ইত্যাদি। কিন্তু বৃহৎ ঘটনাগুলি তাঁর সাহিত্যে তেমন প্রবল ছাপ রাখে নি। এই জীবনগতির প্রাবল্যের পরিমাপ তিনি করতে চান নি।

শান্ত, সরল, স্তিমিতগতি জীবনের ঐশ্বর্যসন্ধানী তিনি। জীবনের খর আবর্তে প্রীতি নেই তাঁর, প্রশান্তি তাঁর কাম্য। জীবনের সক্রিয়তা নয়, সমাহিত অনুভূতি তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য। কর্ম-লোককে প্রায় সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে মনোলোকের সাধনা তাঁর। 'আজকাল আমার মনে হয়,—অনুভূতি, আশা, কল্পনা, স্বপ্ন—এ সবই জীবন' (অপরাজিত, পৃঃ ৩২৫)। জীবন বলতে তিনি এই সীমাবদ্ধ বিষয়কে বুঝতেন।

"জীবন খুব বড় একটা রোমান্স—বেঁচে থেকে একে ভোগ করাই রোমান্স—অতি তুচ্ছতম, হীনতম, একঘেয়ে জীবনও রোমান্স।" (অপরাজিত পৃঃ ৩৯৬)। এই উক্তির মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ যেমন তুচ্ছ ক্ষুদ্র অবহেলিত জীবনকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেলেন তেমনি তুচ্ছতা হীনতা একঘেয়েমিকেই যেন প্রাপণীয় বলে পরোক্ষে সীমা নির্দেশ করলেন। সেই তুচ্ছ হীন একঘেয়ে জীবন যে আরো বৃহৎ

ও মহৎ রোমান্সের অভিমুখী হ'তে পারে, হওয়া উচিৎ—অন্তত সভ্যতার কাছে ঐ তুচ্ছ জীবনগুলোর দাবী তাই—তা তিনি ভাবতে চাইলেন না। রুষোর মত তিনি যেন আধুনিক সভ্যতার কাছ থেকে সরে প্রকৃতিরাজ্যে ফিরে যেতে চাইলেন। কিন্তু রুষোর সমাজচিন্তা ছিল, 'সামাজিক চুক্তি'-র তত্ত্ব তিনি উপস্থিত করেছিলেন।

একঘেয়ে জীবনে রোমান্সের স্বাদ পেতেন বলে তাঁর সাহিত্যেও একঘেয়েমি প্রভূত। বিভূতিভূষণ 'পথের-পাঁচালী'-'অপরাজিত'-এর পরে নতুন বা গভীরতর কিছু আর বলতে পারলেন না। পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকল তাঁর। শিল্পপ্রাণ আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির পথ যেহেতু নানা কলুষ আবর্তের মধ্য দিয়ে প্রসারিত তাই তিনি পয়লা দিনে হাতের মুঠিতে যে-মন্ত্র পেয়েছিলেন, চোখ বুঁজে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে জীবন-পথ পার হয়ে গেলেন। গিয়ে উঠলেন দেবযানে। মাঝে মাঝে এই সমাহিত চিত্তে বিংশ শতাব্দীর তরঙ্গ আঘাত করে, দু' এক সময় তিনি সামান্য বিচলিত হন, তুচ্ছ জীবনের সৎ সরল সৌন্দর্যের যে খুদকুঁড়োটুকু বিংশ শতকের নিশ্বাসে এখনও কলুষিত হয় নি, তাকে বুক দিয়ে আঁকড়ে ধরেন, অতীতকে স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, তারপরে আবার মনোরাজ্যে নিমজ্জিত হয়ে যান। কিন্তু ঐ খুদকুঁড়ো যে সমাজক্ষেত্রে একটা শক্তি এবং সেই শক্তিও ক্রমাগত নিজেকে প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে সম্প্রসারিত করবার চেষ্টা করছে, এই সমাজসত্যকে তিনি ভাল করে লক্ষ্য করতে পারেন নি।

তুচ্ছ হীন অবহেলিত মানুষকে তিনি আন্তরিকভাবেই ভালবাসতেন। কিন্তু সে মানবপ্রেম সেন্টিমেণ্টাল স্তরেই সীমাবদ্ধ, যুক্তিসিদ্ধ সক্রিয়তার পথে অগ্রসর নয়। (সাধারণ মানুষের সরল অনাড়ম্বর সৎ জীবন তাঁকে মুগ্ধ করত কিন্তু তাদের দুঃখ, বেদনা, সংগ্রাম, জয়-পরাজয়, আশা ও হতাশার সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ তিনি মেলাতে পারেন নি। যদি পারতেন তবে তাঁর সাহিত্য একই কথার এত ক্লান্ত

পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্ত হয়ে বিস্তৃত জীবনের সাগর সঙ্গমে উপনীত হতে পারত। দুঃখের বিষয়, তা হয় নি। মন তার এমন দীক্ষিত ছিল যে এক বিষয়ের পুনরাবৃত্তি তাঁর নিজের কাছে ক্লান্তিকর মনে হোতো না। পল্লীজীবনের সৌন্দর্যও যেমন সত্য, তেমনি সত্য তার গতিহীন স্থাণু জড়ত্ব—যেখানে দীর্ঘকাল থাকতে হলে যে কোন সচল-সজীব মনের ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক। সে স্থান মনের মধ্যে ডুব দেওয়ার পক্ষে অবশ্য প্রশস্ত স্থান। তাই তিনি করেছেন, তাই তিনি ভালবাসতেন। সেইজন্য তাঁর ক্লান্তি আসে নি, এক কথা শতবার শতভাষায় ডায়রী ও উপন্যাসে লিখেছেন। কল্প-আলোকে অভিষিক্ত করে দেখতেন বলেই একঘেয়েমিটা তাঁর চোখে পড়ত না। নইলে তাঁর 'একঘেয়ে জীবনও রোমান্স' কথাটা মূলত ভুল, কারণ ও দুটো শব্দ পরস্পর বিরোধী, মনে ওর একটা ভাব জাগলে আর একটা থাকে না।)

ডায়রী ও উপন্যাসে ক্রমাগত বলছেন তিনি, 'আজ বড় ভাল লাগল।' এ যেন নিজের মনকেও শোনানো, কারণ এর বাইরে গেলে আরও বড় একটা 'খারাপ' জগৎ তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছে। সে জগৎকে খোঁজবার বা বোঝবার দরকার নেই। সাপের ভয়ে কেঁচো খোঁড়া থেকে বিরত রইলেন। আর প্রকৃতি কেন্দ্রিক স্বীয় মানসিক ভাবালুতা যদি সময় সময় একটু একঘেয়ে হয়ই, তবু এই ভাল—এই ভাল।

শিল্পী তার জীবনবোধের চূড়ান্ত যায়গাটায় পেঁছোয় বহু মেহনৎ ক'রে। অনেকখানি যন্ত্রণা তার মাশুল। এই মাশুল বিভূতিভূষণ খুব পূরো হারে দিয়েছেন ব'লে মনে হয় না। প্রথম যৌবনে (পথের পাঁচালী ও অপরাজিত-তে) তিনি একটা আবছা রকমের অধ্যাত্মদর্শনে পৌঁছলেন এবং সে অধ্যাত্ম-অনুভূতি এত অক্লেশ-আয়ত্ত যে সন্দেহ হয় যতখানি উচ্চারিত ততখানি তাঁর স্বোপার্জিত কিনা। কৈশোরে একটী বালক অন্যের একটী কথা

মোটামুটী বিশ্বাস ক'রেই ভাবালুভাবে তাকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারে। কিন্তু সেই কথাটাও তার উপলব্ধির গভীরে যেতে বেশ খানিকটা সময় লাগবে। জীবনের পথের প্রতি বাঁকে হোঁচট খেতে খেতে আঘাতে-আঘাতে সে বোধ দৃঢ়ভিত্তি আসন নেবে উপলব্ধির গভীরে। (কিন্তু বিভূতিভূষণ কতকগুলি বিশ্বাস প্রথম যৌবনে গ্রহণ করেছিলেন, বার্ধক্যেও ভোলেন নি, বা নতুন কিছু সংযোজন করেননি। বিশ্বাসগুলিকে—যাকে তিনি সত্য বলে জেনেছেন—বর্তমান জীবন-সমস্যার মুখোমুখি দাঁড় করাতেও যেন তাঁর ভয় ছিল। তিনি জানতেন, মুখোমুখি দাঁড়ালে তাঁর বিশ্বাস কিছুটা টোল খাবে, ভাঙ্গবে, দোমড়াবে, নতুন চেহারা নেবে। এই রূঢ় সহযোগিতাটুকু সব শিল্পীকেই গ্রহণ করতে হয়, কারণ ঐ নতুন-নেওয়া চেহারাটাই বিশেষ শিল্পীর জীবনের খাঁটি সত্য। কিন্তু বিভূতিভূষণ ঐ রূঢ়তাটুকুর ভয়ে সহযোগিতাটুকু নিতে চান নি। তাই সারা জীবনে তাঁর জীবনবোধের কোন অদলবদল হোলো না, বাঁক নিল না, কোন পরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত পর্যন্ত হোলো না। তারুণ্যের বিশ্বাসটীকে হাতের মধ্যে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে চোখ বুঁজে জীবনের পথটা তিনি পেরিয়ে এলেন। রূপকথার রাজপুত্রের পেছনে ডাইনে বামে কত লোক ডাকল। বিভূতিভূষণ সেই দলের রাজপুত্র, যে কোন দিকে না তাকিয়ে রাজকন্যার ধ্যান করতে করতে এসে একেবারে চোখ খুলল সেই কন্যার মুখের ওপর। এক ধরণের সিদ্ধি তাঁর হোলো, আর তাতে এমন মসগুল হয়ে রইলেন যে এর অপূর্ণতা জানলেনও না। কিন্তু ঔপন্যাসিকের ধর্ম সেই রাজপুত্রের মত, যে আহ্বানগুলির উৎস-সন্ধানে বিপদকে বরণ করে, আর বিপদমুক্তির মধ্য দিয়ে পূর্ণ সিদ্ধি পায়। বিপদের বাধার মধ্য দিয়েই সে রাজকন্যাকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করে, পায় তাকে আরো বড় করে, কারণ রাজকন্যার জয়মাল্য ঐ বিপদজয়ী রাজপুত্রের জন্য

যত উন্মুখ থাকে এমন আর কারো জন্য নয়। ঐ রাজপুত্র জীবনকে অনেকখানি দেখল, আর বিভূতিভূষণ জীবনপথে দেখলেন প্রধানত নিজের মন। নিজের মনেরও সবটুকু নয়। দুঃখ-বিপদের আবর্তে প্রাপণীয়ের কামনা যখন উদ্বেল, সেই মথিত মন নয়। প্রশান্ত আত্মতৃপ্ত মন। দুঃখকে তিনি তার সত্যরূপে দেখতে পেলেন না, ভাবরসে জারিয়ে তাকে এক সুখানুভূতির পর্যায়ে নিয়ে এলেন—পূর্বস্মৃতি রোমন্থনের ঈষৎ বেদনামিশ্রিত আনন্দের মত সে অনুভূতি। তাই তাঁর কাছে 'সুখ ও দুঃখ দুইই অপূর্ব।' (অপরাজিত, পৃঃ ৩৯৬) কিন্তু যে দুঃখ তার নিষ্ঠুরকাঠিন্যের জন্য কোন ভাবরস গলে না, যে দুঃখ নগ্ন সত্যমূর্তি, তাকে বিভূতিভূষণ চিনতেন না। নির্লজ্জ অমানুষিকতা অপসারণের মর্মান্তিক প্রয়াসের ব্যর্থতার মধ্যে যে মহিমান্বিত দুঃখ স্বয়ংপ্রভ, তাকে তিনি দেখেন নি। বিপদকালীন সুদীর্ঘ-সংগ্রাম-শেষের প্রবল বিজয় আনন্দের স্বাদ তিনি জানতেন না। অথচ বিংশ শতকের চল্লিশের কোঠায় বিশেষ করে এই বিষয়গুলি কী প্রবল আলোড়নই এনেছিল জনজীবনে। রবীন্দ্রনাথ—যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর অপেক্ষাকৃত নিস্তরঙ্গ যুগে জীবনের অর্ধেকটা কাটিয়েছেন, যাঁর মনের আশ্রয়ভূমি দীর্ঘ ঐতিহ্য-চর্চায় সুদৃঢ় ছিল—তিনিও ঐ সময় অতিরিক্ত নাড়া খেয়েছিলেন।

কিন্তু বিভূতিভূষণ অবিচলিত। দু' একটী গল্পে তাঁর অস্থিরতার সামান্য ইঙ্গিত আছে মাত্র। কিন্তু সেগুলিতে বহির্জগতের আলোড়নের প্রবলতার তুলনায় তার সাহিত্যরূপ অত্যন্ত দুর্বল।

বস্তুত, বিভূতিভূষণ খুব উচ্চ অনুভূতিশক্তির অধিকারী ছিলেন না। মাঝারি ধরনের অনুভূতিশক্তি ছিল তাঁর। শুধু মাত্র পূর্বোক্ত বিষয়-গুলির ক্ষেত্রেই নয়, সর্ব ক্ষেত্রে। প্রেম তাঁর সাহিত্যে নিস্প্রভ। তাঁর মুখ্য ও প্রিয় বিষয় বস্তু—প্রকৃতি। কিন্তু প্রকৃতি সম্পর্কেও তাঁর অনুভূতি তীব্রতায় ও গভীরতায় রোমান্টিক ইংরেজকবিকুল বা

রবীন্দ্রনাথের তুলনায় বহু নিম্নে। বিভূতিভূষণের উপন্যাস ও গল্পে দীন-দরিদ্র সাধারণ মানুষের কাহিনী আছে। রবীন্দ্রনাথের তুলনায় তিনি এদের অনেক কাছেও ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্বেও রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য', 'দুই বিঘা জমি', 'শাস্তি' ইত্যাদির সমস্তরে মর্যাদা পেতে পারে এমন গল্প বিভূতিভূষণের নেই বললেই হয়। অনুভূতি শক্তির এই আপেক্ষিক ন্যূনতার জন্য মৃত্যু বা শোক বা আনন্দের দৃশ্যও তাঁর সাহিত্যে তেমন দৃঢ় রেখাপাত করতে পারে না। তাঁর সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে তীব্র-আবেগ-উদ্বোধক দৃশ্য বিশেষ নেই। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অপু-চরিত্রে 'গভীর আবেগের আপেক্ষিক অভাবের' অভিযোগ করেছেন। 'আমরা সাধারণতঃ ভাব-গভীরতার যে মাপকাঠি লইয়া চরিত্রের উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার করি, অপু সেই আদর্শ পূরণ করে না।' অপু বিভূতি-সাহিত্যের সর্বপ্রধান চরিত্র বলে এ উদাহরণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, অপু বিভূতিভূষণেরই আদর্শ রূপ। সেদিক থেকেও কথাটি বিচার্য।

বিভূতিভূষণ তাঁর শক্তির সবচেয়ে ভাল প্রকাশ করতে পেরেছেন স্মৃতিধর্মী চিত্র-অঙ্কনে—স্মৃতির আবেগ খুব তীব্র নয়, অপেক্ষাকৃত স্তিমিত বলেই বোধহয়।

অনুভূতিশক্তির এই স্বল্পতাই তার লেখকজীবনের খুব বড় অভাব। গীতিকবির মন নিয়ে উপন্যাস লিখেছিলেন বলে তাঁর কিছুটা সীমাবদ্ধতা অপরিহার্য ছিল, কিন্তু সেই সংকীর্ণতা সত্বেও গদ্য-লিখিয়ে বড় গীতিকবি হিসেবে তিনি স্বীকৃতি পেতে পারতেন যদি অনুভূতিশক্তি তাঁর ন্যূন না হোতো। তাঁর এই শক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে একটি-দুটি উপন্যাসে এবং কয়েকটি গল্পে। বাকী বিপুলায়তন সাহিত্য রচনা না করলেও তাঁর সাহিত্যিক-কৃতিত্বের ইতর-বিশেষ হোতো না।

॥ চার ॥

॥ প্রকৃতিচেতনা ॥

(বিভূতিভূষণের মনের সবচেয়ে বড় আশ্রয় ছিল প্রকৃতি। রোমান্টিক শিল্পীদের পক্ষে এটা নতুন কথা নয়। বিভূতিভূষণের মনও ঐ ধাতু দিয়ে গড়া, এবং রোমান্টিক প্রকৃতিপ্রীতির সাধারণ লক্ষণগুলি তাঁর ক্ষেত্রেও প্রায় সর্বাংশে বলবৎ।)

প্রাচীনকালের কবিদের কারো প্রকৃতি-প্রেম ছিল না এমন নয়। কিন্তু প্রাচীন দৃষ্টি আর আধুনিক কালের রোমান্টিক দৃষ্টির মধ্যে বেশ কিছুটা পার্থক্য আছে।

মানুষ তার একেবারে আদিমকালে বোধহয় প্রকৃতিকে ভালবাসে নি। বরং সে-সময় প্রকৃতি সম্পর্কে ভয় থাকাটাই তার স্বাভাবিক। মানুষ তখনও প্রতিকূল প্রকৃতিকে নিজের বুদ্ধি ও দক্ষতা দিয়ে অনুকূল করে নিতে পারেনি। প্রকৃতির নগ্ন নখ-দন্ত তখন মানুষের অস্তিত্বের উপর প্রতি মুহূর্তে হানা দিচ্ছে। এ অবস্থায় প্রকৃতি সম্পর্কে প্রীতি নয় ভীতি জাগাই স্বাভাবিক। তখনও সম্পর্কটা মৈত্রীর নয়, বৈরীর। সেকালে সাহিত্যের জন্ম হয়নি, নইলে সে-সাহিত্যে মানুষের এই ভীতির ছাপ পাওয়া যেত। আদিম মানুষের প্রকৃতি-প্রতীক দেব-কল্পনার ভয়ঙ্করত্বের মধ্যে সেই মনের কিছুটা পরিচয় এখনও আছে।

ক্রমে মানুষের অগ্রগতি হোলো; বিশেষ করে কৃষি-সভ্যতার পত্তনের সময় থেকেই প্রকৃতি তার প্রাণহন্ত্রী রইল না, প্রাণদাত্রী হয়ে উঠল। মানুষের নিজের বুদ্ধির বলেই প্রকৃতি তার সহায়িকা

হয়ে দাঁড়াল। প্রকৃতির মধ্যে নিষ্ঠুর হিংস্র জিঘাংসু সত্তাকে তখন আর সে দেখল না, দেখল কোমল করুণাময় একটা প্রাণ। বাল্মীকি-কালিদাসে এই দৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। প্রকৃতি ও মানুষের আত্মীয়তার বাণী এদের কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু এদের দৃষ্টির সঙ্গে নব্য কালের রোমান্টিক দৃষ্টির পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক, কারণ সমাজের চেহারাটাও পালটে গেছে অনেকখানি।

একালের সমাজ নগর-কেন্দ্রিক, শিল্পনির্ভর, জটিল এবং প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন। এ সমাজের ভারকেন্দ্র গ্রামীণ কৃষি-অঞ্চল থেকে স'রে বৃহৎ শিল্প-এলাকায় চলে এসেছে। পূর্বে যেখানে মানুষ প্রকৃতির কোলেই বড় হোতো, মিলে-মিশে থাকত দুজনে, আজ সেখানে প্রকৃতিকে লেপে-মুছে দূর করে মাটিতে বস্তী ও যন্ত্র, আর আকাশে কালো ধোঁয়া ছড়ানো। মুখ-দেখাদেখি দুজনের বন্ধ। এই ব্যবধান আমাদের প্রকৃতিপ্রেমের তীব্রতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। একদিন যা নিকটে ছিল আজ তা দূর। একদিন যার মধ্যেই প্রায় আমরা বাস করেছি, আজ সহস্র সাধনাতে তাকে আর পুরো ফিরে পাওয়ার উপায় নেই, কারণ প্রকৃতিকে উৎপাটিত করেই নতুন সভ্যতার পত্তন। এ কালে তাই এ সভ্যতা প্রকৃতির সৌন্দর্যকে যত নষ্ট করবে তত আবার তার জন্য কাঁদবেও। সভ্যতার এ গতিকে সম্পূর্ণ রোধ করাও যাচ্ছে না। প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবধান কমানোও সম্ভব হচ্ছে না। আর এই ব্যবধানই পাওয়ার আগ্রহকে তীব্রতর করছে। প্রাচীন কাল এ আগ্রহকে এত তীব্রভাবে অনুভব করেনি।*

---

* No age ever grew so ecstatic over natural beauty as the ninteenth century, at the same time no age ever did so much to deface nature. No age ever so exalted the country over the town, and no age ever witnessed such a crowding into urban centres.

—Irving Babbitt, Rousseau and Romantcism.

আগ্রহের এই পরিমাণগত তারতম্য এত বেশী যে এটা প্রায় একটা গুণগত পার্থক্যে গিয়ে পৌঁছেছে। রবীন্দ্রনাথ এই দুই আকর্ষণের চরিত্রভিন্নতা বোঝাতে একটাকে বলেছেন, 'ভাইবোনের সম্পর্ক', আর একটাকে বলেছেন, 'স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক'। প্রথমটা কালিদাস ইত্যাদি ভারতীয়দের, অর্থাৎ প্রাচীনদের, দ্বিতীয়টা ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীট্‌স্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিদের অর্থাৎ এ কালের রোমান্টিকদের।

রবীন্দ্রনাথ যদিও এই পার্থক্যটা উল্লেখ করেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পার্থক্য বলে, আসলে এ পার্থক্য কিন্তু প্রাচীন ও নবীনের, এবং পার্থক্যের কারণ পুরানো ও নতুন সমাজের রূপ-ভিন্নতা।

রবীন্দ্রনাথের উক্তিটা তুলে দিচ্ছি (সৌন্দর্যের সম্বন্ধ, পঞ্চভূত) ঃ

'প্রকৃতির সহিত আমাদের যেন ভাইবোনের সম্পর্ক এবং ইংরাজ ভাবুকের যেন স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক। আমরা জন্মাবধিই আত্মীয়, আমরা স্বভাবতঃই এক। আমরা তাহার মধ্যে নব নব বৈচিত্র্য, পরিসূক্ষ্ম ভাবচ্ছায়া দেখিতে পাই না, এক প্রকার অন্ধ অচেতন স্নেহে মাখামাখি করিয়া থাকি। আর ইংরাজ, প্রকৃতির বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশ করিতেছে। সে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে বলিয়াই তাহার পরিচয় এমন অভিনব, এমন আনন্দময়, তাহার মিলন এমন প্রগাঢ়তর। সেও নববধূর ন্যায় প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, প্রকৃতিও তাহার মনোহরণের জন্য আপনার নিগূঢ় সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত করিতেছে। সে প্রথমে প্রকৃতিকে জড় বলিয়া জানিত, হঠাৎ এক দিন যেন যৌবনারম্ভে তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া তাহার অনির্বচনীয় অপরিমেয় আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য আবিষ্কার করিয়াছে। আমরা আবিষ্কার করি নাই ; কারণ, আমরা সন্দেহও করি নাই, প্রশ্নও করি নাই।

'আত্মা অন্য আত্মার সংঘর্ষে তবেই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারে, তবেই সে মিলনের আধ্যাত্মিকতা পরিপূর্ণ মাত্রায় মণ্ডিত হইয়া উঠে। একাকার হইয়া থাকা কিছু না থাকার ঠিক পরেই।

কোন একজন ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন, ঈশ্বর আপনারই পিতৃ-অংশ এবং মাতৃ-অংশকে স্ত্রী-পুরুষ রূপে পৃথিবীতে ভাগ করিয়া দিয়াছেন; সেই দুই বিচ্ছিন্ন অংশ এক হইবার জন্য পরস্পরের প্রতি এমন অনিবার্য আনন্দে আকৃষ্ট হইতেছে; কিন্তু এই বিচ্ছেদটি না হইলে পরস্পরের মধ্যে এমন প্রগাঢ় পরিচয় হইত না। ঐক্য অপেক্ষা মিলনেই আধ্যাত্মিকতা অধিক।'

এই 'ঐক্য' প্রাচীন যুগের বৈশিষ্ট্য, বিচ্ছেদ এ যুগের, আর এ যুগে তাই 'প্রগাঢ় পরিচয়'।

প্রাচীন পাশ্চাত্য সম্পর্কেও এ ঐক্যের কথা সত্য। গ্রীকদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা নাকি never saw the oak tree without at the same time seeing the dryad.' প্রকৃতিকে তারা ঠিক 'জড়' ভাবত না। খ্রীষ্টান ধর্মের প্রসারের পরে অবশ্য এই ঐক্য-ধারা ব্যাহত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

প্রাচীন ও নবীন দুই আলাদা সমাজের পরিপ্রেক্ষিত থেকে প্রকৃতিকে দেখবার দরুণ তাদের দৃষ্টির আরও একটা বড় পার্থক্য ঘটেছে। প্রাচীন সমাজ ছিল প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ; প্রকৃতির মধ্যেই মানুষ অনেকটা বাস করত, তাই তার আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতির প্রতিফলন সে প্রকৃতির মুখে দেখতে চাইতো। যেন প্রকৃতিও মানুষের মত অনুভূতিসম্পন্ন একটা সত্তা—তার নিজের আনন্দ-বেদনা আছে, মানুষের জন্যে কিছুটা বোধশক্তি আছে। অর্থাৎ যে-প্রকৃতির মধ্যে মানুষকে বারো মাস থাকতে হোত, তাকে সে অনেকটা মানবায়িত করে নিয়েছিল। প্রকৃতিকে তখন humanize করে নেওয়ার এই প্রবণতা ছিল।

আর একালে যখন মানুষ প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন, এবং সমাজের জটিলতা ও কৃত্রিমতায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, তখন এই শ্বাসরোধী আবহাওয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে বলছে 'Back to nature'। এ

প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্খা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ করবার জন্য নয়, স্বীয় সত্তাকে তার মধ্যে বিলীন করে দেবার জন্য। সমস্ত জটিলতা ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বভাব-সরল পথে ঐ তরুলতা, পশুপাখী, সমুদ্রপর্বত ও আকাশবাতাসের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দেবার কামনা তার। বাস্তব যেখানে এই কামনার পথে বাধা, সেখানে রোমান্টিক শিল্পী তার কল্পজগতে ভাবসম্মিলনটা ঘটায়, তার জাগর স্বপ্নের প্রতি মুহূর্তের প্রয়াস 'imaginative melting of man into outer nature.'। অর্থাৎ মানুষকে নিসর্গীভূত করা এ যুগের সাধারণ প্রবণতা।

দুই যুগের এই পার্থক্যটা এক কথায় দাঁড়ায়, প্রাচীন কালে nature-কে humanize করা হোতো। আর এ কালে man-কে naturalize করার ঝোঁক। (অবশ্য এ দুটো সাধারণ ঝোঁক, এর ব্যতিক্রমও নিশ্চয়ই আছে।) আগের কালের চমৎকার উদাহরণ হবেন কালিদাস। তিনি মেঘকে দূত এবং পর্বতকে মানুষ করেছেন, সেটা বড় কথা নয়। তার চেয়ে অনেক বেশী উল্লেখযোগ্য 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম', যেখানে প্রকৃতি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মানবীয় ব্যক্তিত্ব পেয়েছে।

আর এ কালের ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের লুসি মানুষ হয়েও প্রকৃতির অংশ বিশেষ। আমাদের সাহিত্যে কপালকুণ্ডলা আরণ্য-সত্তা। রবীন্দ্রনাথেও এ ঝোঁক আছে; বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁর গল্পগুচ্ছের দু'একটি চরিত্র। বিভূতিভূষণের অপুও 'অর্ধেক মানব অর্ধেক প্রকৃতি।'

আমাদের বাংলা-সাহিত্যে রোমান্টিক প্রকৃতি-চেতনার উন্মেষকাল উনবিংশ শতাব্দী। তার আগে প্রকৃতি এসেছে বারমাস্যার গতানুগতিক খাতে, অথবা কোন রীতিরক্ষার খাতিরে। সাহিত্যের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তিতে যেমন মধ্যযুগের বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের ক্লান্তি নেই, প্রকৃতি-বর্ণনার কতগুলি ধরা-বাঁধাগত প্রচারেও তাঁরা তেমনি শ্রান্তিহীন। কিন্তু এই বর্ণনাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যতটা পূর্বসূরীর

প্রতি অন্ধ আনুগত্য, ততটা আত্মমনের অনুভূতিতে সত্য নয়। প্রকৃতি সেখানে প্রায়ই অনড় একটা পটভূমি মাত্র, শিল্পীর মনের তাপে বিগলিত প্রাণবন্ত নয়।

উনবিংশ শতাব্দী পাশ্চাত্য-সংস্পর্শের যুগ, গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যুগ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্বোধনের যুগ। তখন আমরা পাশ্চাত্য-কবিদের কাছে প্রেরণা পেলাম, পূর্বতন সংস্কারকে বর্জন করবার দুঃসাহস নিয়ে অগ্রসর হলাম, প্রকৃতির মধ্যে আত্মলীন করে দিয়ে কাব্য রচনা করলাম।

সমাজক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মকেন্দ্রিক রচনার সূত্রপাতও এই যুগে—লিরিকে যার সব চেয়ে বড় প্রকাশ। মধ্যযুগে সম্প্রদায়গত মনের চেহারাটা বেশী ধরা পড়ত কাব্যে, শিল্পে। ব্যক্তিমনের চেহারাটা প্রাধান্য পেল এ যুগে। শুধু প্রাধান্য বললে কম বলা হয়, লিরিক প্রভৃতিতে ব্যক্তিমন একচ্ছত্র। ব্যক্তিমনের প্রকাশের সুযোগ এই রকমভাবে না বাড়লে রোমান্টিক চেতনার পূর্ণ প্রস্ফুটন সম্ভব নয়। সমাজ-মনের গড়পড়তা প্রবণতা এ বিষয়ে যতটুকু, তার ওপরে নির্ভর করে প্রকৃতির মধ্যে আত্মবিলুপ্ত হয়ে যাওয়া অসম্ভব।

রোমান্টিক প্রকৃতিচেতনার মধ্যে একটা প্রবল আত্মমুখিতা আছে। প্রকৃতির সঙ্গে রোমান্টিক শিল্পীদের যে সাযুজ্য, তা আসলে তাদের mood-এর সঙ্গেই সাযুজ্য। (The Rousseauist, on the other hand, does not in his "communion" with nature adjust himself to anything. He is simply communing with his own mood.—Irving Babbitt.এর পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৩৩)। রুশোর মতে, প্রকৃতি মৃত, যদি না তাকে প্রেমের উত্তাপে সঞ্জীবিত করা হয়। (বিভূতিবাবুও 'আরণ্যকে' লিখেছেন, 'অনেকদিন ধরিয়া প্রকৃতির সেবা না করিলে' তার দান মেলে না'।) রুশো এক যায়গায় বলছেন, 'Beloved Solitude, beloved

solitude, where I still pass with pleasure the remains of a life given over to suffering. Forest with stunted trees, marshes without water, broom, reeds, melancholy heather, inanimate objects, you who can neither speak to me nor hear me, what secret charm brings me back constantly into your midst? Unfeeling and dead things, this charm is not in you; it could not be there. It is in my own heart which wishes to refer back everything to itself.' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৩৩)।

কোলরিজেও এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়ঃ

O Lady! we receive but what we give,
And in our life alone does nature live.

এই আত্মমুখিতার সব চেয়ে যোগ্য আধার গীতিকবিতা। বাংলা সাহিত্যে উনবিংশ শতকে গীতিকবিতার জন্ম। আর এই গীতিকবিতার মধ্যেই রোমান্টিক প্রকৃতি-চেতনা আত্মপ্রকাশের সুষ্ঠু অবলম্বন পায়। বিহারীলালে তার অস্ফুট সূচনা, রবীন্দ্রনাথে তার পরিণতি। এবং রবীন্দ্র-সরণীতেই বিভূতিভূষণের আবির্ভাব। বিভূতিভূষণ অবশ্য লিখেছেন উপন্যাস। ফলে তাঁর সাহিত্যে আধার ও আধেয়ের একটা বিরোধ আছে তাঁর উপন্যাস অতিমাত্রায় আত্মমুখী—গীতিকবিতার মত।

বাংলা কথাসাহিত্যের মাধ্যমে রোমান্টিক প্রকৃতিচেতনার প্রকাশপ্রয়াসে বিভূতিভূষণ এক প্রধান নায়ক—হয়তো বা সর্বপ্রধান। বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা', রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্প, এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু' একটি অস্ফুট উদাহরণ ছাড়া অনুরূপ প্রয়াসের স্বাক্ষর বাংলা সাহিত্যে অনুপস্থিত।

বিভূতিভূষণের 'প্রকৃতি' মানব-বর্জিত নয়। আদিবাসী, অরণ্যচারী

শিশু—এরা প্রকৃতিলীন সত্তা। গ্রামীণ মানুষও প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ। বিভূতিভূষণের 'প্রকৃতি' যেমন সুন্দর ও মঙ্গলময়, তাঁর এই মানুষরাও তাই। এ মনোভাবেরও উৎস রোমাণ্টিক চিন্তাধারার ঐতিহ্যে— 'Man, in short, is naturally good and nature hersalf is beneficent and beautiful.' (আর্ভিং ব্যাবিট প্রণীত পূর্বোক্ত Rausseau and Romaticism গ্রন্থের Romantic Morality অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

এ প্রকৃতিলীন মানুষকে তাঁর বিশেষত সুন্দর লাগে। তিনি নিজেকে এদের সঙ্গে মিশিয়ে দিতেও চান। কিন্তু পারেন কি? সাহিত্যে তবু হয়তো পারেন, কিন্তু বাস্তব জীবনে? তাঁর ডায়রীর একটি দৃশ্য এখানে উদ্ধার করি: 'সে বনানীর মধ্যে বসে বনের দুলালী মেয়েদের সঙ্গে বনের গল্প করতে আমাদের এত ভাল লাগছিল যে কিছুতেই সেখান থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না। ভাত হয়ে গেল, বড় বড় শালপাতার পাত্রে ফেন শুদ্ধ ঢেলে বিনা নুনে বিনা তরকারীতে দিব্যি খেতে লাগল। বিলাসিতার সর্ব-উপকরণ-শূন্য এই সকল অনাড়ম্বর জীবনধারা আমার কাছে এত নূতন, এত অপরিচিত যে শুধু এই দেখবার জন্য আমি সমস্ত রাত এইভাবে কাটিয়ে দিতে পারি। কিন্তু শীত পড়ে আসছে, এ সময় বাইরে বসে থাকা স্বাস্থ্যের দিক থেকে নিরাপদ নয়। কাজেই আমরা বাংলোর মধ্যে গিয়ে আগুনের ধারে বসলাম।' (বনে পাহাড়ে পৃঃ ৩২-৩৩)।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রেম

সাহিত্যের অন্যতম মুখ্য বিষয়বস্তু প্রেম বিভূতিভূষণে তেমন প্রাধান্য পায়নি। প্রেমের রহস্য উন্মোচন বা তার গতিবেগ পরিমাপে তাঁর তেমন উৎসাহ নেই। অপুর মনোবিকাশের খুঁটিনাটি বর্ণনা সত্ত্বেও তার প্রেম-চেতনার উদ্বোধন সম্পর্কে নীরবতা লেখকের এই বিষয়ে আপেক্ষিক অনুৎসাহ প্রমাণ করে। তাঁর সাহিত্যের সুবৃহৎ পটভূমিতে প্রেমের স্থান কতটুকুই বা!

প্রেম যেখানে এসেছে বিভূতি-সাহিত্যে, এসেছে একটা বিশেষরূপে। শান্ত গৃহশ্রী তাঁর প্রেমের প্রদীপে। সে দীপের আলোর পরিধি ছোট, প্রকৃতি স্নিগ্ধ। এত উত্তাপহীন সে বর্তিকা যে মনে হয় বুঝি এক পসলা জ্যোৎস্না শিখার গায়ে কে জড়িয়ে দিয়েছে। সে-জ্যোৎস্না কল্পলোকে ভাবুকতা জাগায়, দাবানল জ্বালায় না। উত্তেজনা বা উন্মাদনা সে-প্রেমের জগৎ থেকে নির্বাসিত। বিভূতিভূষণে প্রেমের স্রোত ইছামতীর মতই স্তিমিত, নিস্তরঙ্গ। খরস্পর্শা সর্বনাশী রূপ তার নয়। পাড় সে ভাঙ্গে না, পাড়ে জাগায় শ্যামসমারোহ। তার প্রেম প্রবল নয়, কোমল। তিনি প্রেমের প্রমত্ত শক্তিকে দেখেন নি, তার প্রেমে পরম স্বস্তি। তার দাম্পত্য প্রেমের আড়ালে বাৎসল্যের অন্তঃস্রোত দুর্লক্ষ্য নয়।

অপু-অপর্ণার প্রেম এর বিশিষ্ট উদাহরণ। ঘুমন্ত অপুকে দেখে অপর্ণার 'এমন একটা মায়া হয় ওর ওপরে।' (অপরাজিত, পৃঃ ২২৮)।

সেই মায়ার স্বরূপ খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন বিভূতিভূষণ অন্যত্র 'অপুর উপর তাহার একটা অদ্ভুত স্নেহ গড়িয়া উঠিয়াছে, ছেলের উপর মায়ের স্নেহের মত। অপুর কৌতুকপ্রিয়তা, ছেলেমানুষি, খেয়াল, সংসারানভিজ্ঞতা, হাসিখুশি, এসব অপর্ণার মাতৃত্বকে অদ্ভুতভাবে জাগাইয়া তুলিয়াছে।' (অপরাজিত, পৃঃ ২২৫)

আর অপর্ণা-প্রসঙ্গে অপুর চিন্তাও এর পরিপূরক। অপু ভাবে, 'ঠিক এইভাবেই কথা বলিত মা। অপুর অদ্ভুত মনে হয়, মায়ের মত স্নেহশীলা, সেবাপরায়ণা, সেইরকমই অন্তর্যামিনী।' (অপরাজিত, পৃঃ ২২৫)। অন্যত্র অপর্ণা-প্রসঙ্গে অপুর মনোভাব এইরকমঃ 'অপু ভাবে, মা ঠিক এই ধরনের কথা বলিত—এই ধরনেরই স্নেহপ্রীতি-ঝরা চোখে। সে দেখিয়াছে, কি দিদি, কি রাণুদি কি লীলা, কি অপর্ণা—এদের সকলেরই মধ্যে মা যেন অল্পবিস্তর মিশাইয়া আছেন—ঠিক সময়ে ঠিক অবস্থায় ইহারা একই ধরনের কথা বলে, চোখে মুখে একই ধরনের স্নেহ ফুটিয়া ওঠে।' (অপরাজিত, পৃঃ ১৯৩)।

বস্তুত, বিভূতিভূষণের মধ্যে সারা জীবন একটি চিরকিশোর লীলা ক'রে গিয়েছে, সেই চিরকিশোর সকল নারীর মধ্যে মা ছাড়া আর কিছু খুঁজে পায়নি। মাতৃস্নেহের দীপে তার প্রেমের আরতি। বিভূতিভূষণের প্রেম বাৎসল্যের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়, নিজের শক্তিতে সে অনন্যনির্ভর নয়।

বিভূতিভূষণের প্রেম বিশ্বের পটভূমিতে ন্যস্ত; সেখান থেকে তাঁর প্রেম একটা সূক্ষ্ম নিগূঢ় রস সঞ্চয় করে। রূপানুরাগের মুহূর্তে ব্যাপ্ত দেশকালের স্মৃতি-জগৎ অপুর মধ্যে কথা বলে উঠেছে। দশমহাবিদ্যার ষোড়শী মূর্তি, বেহুলা-লখীন্দর, রাধিকার প্রেম ও গ্রামীণ উপকথার শত সুপ্ত স্মৃতি অপুর মনে জেগে ওঠে অপর্ণাকে কেন্দ্র করে। আর প্রকৃতিজগৎ থেকেও অপর্ণা যেন তার দেহলাবণ্য

সংগ্রহ করেছে। অপর্ণা সম্বন্ধে অপুর মনে হয়ঃ 'এই দূর পল্লীপ্রান্তরের নদীতীরের সকল শ্যামলতা, সকল সরসতা, পথিপ্রান্তে বনফুলের সকল সরলতা ছানিয়া এ মুখ গড়া...'

• 'এসব জিনিষের দিকে' যেসব চরিত্রের তেমন মন নেই, তারাও প্রেমের মুহূর্তে প্রকৃতি-সচেতন হয়ে ওঠে। তাদের প্রেম শুধুমাত্র ব্যক্তিসীমায় আবদ্ধ না থেকে বিশ্বপরিসরে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। যেমন, 'দুই বাড়ি' উপন্যাসের নায়ক নিধু। মঞ্জুর প্রতি তার প্রেমানুভূতি জাগলে পর 'ছায়াভরা পথে শরৎ-প্রভাতের স্নিগ্ধ হাওয়ায় যেন নবীন আশা, অপরিচিত অনুভূতি সারা দেহের ও মনের নব পরিবর্তন আনিয়া দেয়। গাছের ডালে বন্য মটরলতা দুলিতেছে, তিৎপল্লার ফুল ফুটিয়াছে—এবার বর্ষায় যেখানে-সেখানে বনকচুর ঝাড়ের বৃদ্ধি অত্যন্ত যেন বেশী। নিধু আশ্চর্য হইয়া ভাবিল—এসব জিনিষের দিকে তাহার মন তো কখনোও তেমন যায় না, আজ ওদিকে এত নজর পড়িল কেন? শরত প্রভাতের স্নিগ্ধ হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়া আছে কাল বিকালে শোনা মঞ্জুর গানের সুর।' (দুই বাড়ি, সিগনেট সংস্করণ, পৃঃ ৪৪)।

কিন্তু বিভূতিভূষণ যেন এই প্রকৃতিরাজ্যেও থামতে চান না, তাঁর প্রকৃতিদৃষ্টি যেমন প্রকৃতির অন্তরালে আর এক অধ্যাত্মসত্তাকে অনুসন্ধান করতে চায়, তেমনি প্রেমের ক্ষেত্রেও বিভূতিভূষণের দৃষ্টি প্রকৃতির যবনিকা উত্তোলন-প্রয়াসী। তাঁর চেতনায় প্রেমানুভূতি ও অধ্যাত্মানুভূতি প্রায় এক হয়ে মিশে আছে। 'দৃষ্টিপ্রদীপে' এর চমৎকার উদাহরণ আছে। জিতু-মালতীর প্রেমের প্রথম স্তর জিতুর মনে এই রকম ভাব জাগায়ঃ "বাইরের মাঠে এসে দাঁড়িয়ে মনে হল আকাশ-বাতাসের রূপ ও রং যেন এক এই মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেছে চোখে। এই সেই মাঠ, সেই নীলাকাশ, মাঠের মধ্যে দ্বারবাসিনীর কামারদের কাটানো বড় দীঘিটা, সবই সেই আছে—

কিন্তু মালতীর মুখের একটি কথায় সব এত সুন্দর, এত অপরূপ, এত মধুময় হয়ে উঠল কেন ?' (দৃষ্টিপ্রদীপ, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১৪৩)।

এর পরে জিতুর অনুভূতি 'ঠিক সেই অদ্ভুত রাত্রিটির মত', যেদিন সন্ধ্যার সৌন্দর্যে শূন্যপথে অদৃশ্য চরণে দেবতার ছায়া মনে নেমেছিল। 'অনুভূতি হিসেবে দুই-ই এক। কোন প্রভেদ নেই।' (দৃষ্টিপ্রদীপ, পৃঃ ১৪৩)। জিতুর মনের অপর্ব ভাবকে 'আনন্দও বলতে পারি, প্রেমও বলতে পারি, ভক্তিও বলতে পারি। তার মধ্যে ও তিনটেই আছে।' (দৃষ্টিপ্রদীপ, পৃঃ ১৬৬)। ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে জিতু বলেছে, 'ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকার ভক্তির প্রকৃতি মালতীর প্রতি আমার ভালবাসার চেয়ে পৃথক নয়। কোন পার্থক্য নেই। একই অনুভূতি—দুটো আলাদা আলাদা নাম মাত্র।' (দৃষ্টিপ্রদীপ, পৃঃ ১৬৭)।

দেবতাকে প্রিয় এবং প্রিয়কে দেবতায় রূপান্তরিত করবার যে ঐতিহ্য আমাদের দেশজ, এবং যা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নতুন প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত, তারই অনুসরণ যেন বিভূতিভূষণেও শোনা যায়। এই যোগসাধনের অনুভূতি 'দৃষ্টিপ্রদীপ' ছাড়াও বিভূতি-সাহিত্যের অন্যত্র ছড়িয়ে আছে। শেষ জীবনে বৈকুণ্ঠলোক ও মর্ত্যলোকের স্বাদকে সম্মিলিত করবার চেষ্টায় যে বই লিখেছিলেন (দেবযান) তাতেও এর পরিস্ফুট স্বাক্ষর আছে। 'দৃষ্টিপ্রদীপ' বইটির মধ্যে এই 'দেবযান' যাত্রার ইঙ্গিত আছে। 'দৃষ্টিপ্রদীপে'র প্রেম-জ্যোতি মর্ত্যলোকেই উদ্ভাসিত হয়েছিল,—বিভূতিভূষণ তাতে তৃপ্ত হতে পারেন নি। তাই পরবর্তী উত্তরণ একেবারে দেবলোকে। 'দৃষ্টিপ্রদীপে'র শেষপাতায় রয়েছে এই বর্ণনা : 'মালতীও চলে গিয়েছে কত দিন হল, পৃথিবী ছেড়ে কোন প্রেমের লোকে, নক্ষত্রদের দেশে, নক্ষত্রদের মতই বয়সহীন হয়ে গিয়েছে।" সেই প্রেমলোক নক্ষত্রদেশের কথাই 'দেবযান'। মর্ত্যের ধূলোবালির ছোঁয়া যাতে একবিন্দুও

না লাগে এমন মানস-আদর্শজগতের কাহিনী এটা। তাতে ধূলো লাগেনি সত্যি, কিন্তু মাটি-মার রসের যোগানও যেন স্তিমিত, তাই অপূর্ণতা সত্ত্বেও জিতু-মালতীর প্রেম মনে যতটা দাগ রাখে যতীন-শান্তির খুঁতহীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত প্রেম তা রাখে না।

বিভূতিভূষণে প্রেম বিদেহ। মনোলোকে স্নিগ্ধ ভাবকল্পনার কলাপ-বিস্তার, সেবা ও শান্তি তাঁর প্রেমের অনুষঙ্গ। তাঁর অবৈধ প্রেমও এর ব্যতিক্রম নয়। সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেম নিষেধের ফলেই উদ্দাম, অতি উন্মুখ, প্রচণ্ড-গতি, প্রলয়ংকর ; এ প্রেমের প্রকৃতিই অবাধ্য একগুঁয়েমি। কিন্তু বিভূতিভূষণে এ প্রেমও আশ্চর্য পোষ-মানা আনুগত্যে সংযত। অসুস্থ উন্মত্ত উত্তেজনা দূরে থাক, উত্তপ্ত প্রেম-কামনার স্পর্শও তাতে নেই। গয়ামেম ও বড় সাহেবের প্রেম, কিংবা গয়ামেমের জন্য প্রসন্ন আমীনের প্রেম (ইছামতী) অসামাজিক হয়েও অনুত্তেজক। উভয় ক্ষেত্রেই প্রেম দেহকে অতিক্রম করে ভাবজগতে উত্তীর্ণ।

অপু-লীলার প্রেমও সমাজ-নিষিদ্ধ এবং শ্রেণীভেদের প্রাচীরও তাদের মধ্যে দুস্তর। কিন্তু নিষেধ বা ভেদের বাধা তাদের প্রেমে তীব্র ঘূর্ণি তোলেনি। মধুর করুণ মৃদুচ্ছন্দ রাগিনীর আলাপ তাদের সম্পর্কের তারে। সে-সম্পর্ক অদৈহিক অমৃতলোক-যাত্রী। সে প্রেমসম্পর্ক ভাবলোকের এত উঁচু-সুরে বাঁধা, এবং এত নিরঙ্কুশ যে অপর্ণা-প্রসঙ্গও সেখানে কোন সংঘাত জাগায় না।

'বিপিনের সংসার'-এ পরকীয়া প্রেমের সংখ্যা—চার। বিপিন ও মানী, বিপিন ও শান্তি, বিপিনের বাবা বিনোদ চাটুজ্যে ও কামিনী গোয়ালিনী, বিশ্বেশ্বর মাষ্টার ও বাগ্‌দী বিধবা। পটল ও বীণার প্রেমও গ্রামীণ সমাজের বিধি-বহির্ভূত। নিষেধের ফলেই এই ধরণের প্রেমে একটা দুর্বারতা ও তীব্রতা থাকার কথা ছিল। কিন্তু এই পাঁচটির একটিতেও সে-জাতের কিছু নেই। সবগুলিই বিভূতি-সুলভ

স্নিগ্ধতা, কারুণ্য ও মাধুর্যের স্বাক্ষরবাহী; এবং অদৈহিক। এতগুলি অসামাজিক প্রণয়ের একটিতেও সর্বনাশের বিশেষ আঁচ লাগেনি। তাঁর প্রেমের আগুনে দাহ নেই, শুধু আলো। প্রেমের ব্যর্থতা যন্ত্রণার সৃষ্টি করে না বিশেষ, মনে ভাবরসে জারিত হয়ে করুণ-মধুর রসের সৃষ্টি করে।

বিভূতিভূষণের কাছে শোনা গেল যে বিপিন তাড়িখোর, দেহ-বুভুক্ষু ও লম্পট। এ অংশ আমাদের দেখানো হয়নি, শোনানো হয়েছে অতীতের স্মৃতি বা মানীর কাছে বিপিনের স্বীকৃতি হিসেবে। মানীর সঙ্গে প্রেম-সম্পর্কে কিন্তু বিপিনের চেহারা সম্পূর্ণ অন্য। মানীর প্রেম অনুভব করবার পর 'একটি অদ্ভুত মনের ভাবের সহিত বিপিনের পরিচয় ঘটিল আজ হঠাৎ এই মাঠের মধ্যে। মানীর সঙ্গে ভাল-বাসার যে সম্পর্ক তাহার গড়িয়া উঠিয়াছে, এতদিন অন্তত বিপিনের মনের দিক হইতে তাহা দেহসম্পর্কহীন ছিল না, মনে মনে মানীর দেহকে সে বাদ দিতে পারে নাই। বিপিনের স্বভাবই তা নয়। সূক্ষ্ম মানসিক স্তরের আদানপ্রদান তাহার ধাতুগত নয়। মানীর সম্বন্ধে এ আশা বিপিন কখনই ছাড়ে নাই যে, একদিন না একদিন সে মানীকে নামাইবে তাহার নিজস্ব নিম্নস্তরে। সুবিধা সুযোগ এখন নাই বলিয়া ভবিষ্যতেও কি ঘটিবে না?

'আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল, মানীর সহিত তাহার সম্বন্ধ অন্য ধরণের। মানী তাহাকে যে স্তরে লইয়া গিয়াছে, বিপিনের মন তাহার সহিত পরিচিত ছিল না। অনেক মেয়ের সঙ্গে বিপিন মিশিয়াছে পূর্বে অন্যভাবে। মন বলিয়া জিনিষের কারবার ছিল না সেখানে।'

লেখকের এত কথা বলা বোধহয় আবশ্যক ছিল না। মানীর দেহের প্রতি বিপিনের লোভ লেখকের উক্তিতে মাত্র বিবৃত, বিপিনের চরিত্র-ঘটনায় তা স্বীকৃত নয়। লেখকের এই উক্তি পড়ে

পাঠক বরং হঠাৎ বিস্মিত হয়—এমন লোভও বিপিনের ছিল নাকি! কারণ বিপিন বরাবরই 'সূক্ষ্ম মানসিক স্তরের' প্রেমিক হিসেবে পাঠকের কাছে প্রতিভাত।

বস্তুত, 'সূক্ষ্ম মানসিক' ছাড়া অন্য কোন স্তরের প্রেমকে বিভূতিভূষণ বর্ণনা করতেই পারেন না। বর্ণনা করতে চানও না, তাঁর মনোধর্মের সায় নেই অন্যত্র। 'সূক্ষ্ম মানসিক স্তর'-এর প্রেম তাঁর কল্পনাশক্তিকে উজ্জীবিত করে। বিপিনের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। এমন কি, বিপিনেরও নারীপ্রেম প্রকৃতিপ্রেম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। যখন বেলা পড়ে রাঙা রোদ কতক জলি ধানের বিস্তীর্ণ ক্ষেতে, কতক বিলের বাবলা-বনে পড়ল, আইনদ্দির নাতি বিলের ওপরের ডাঙায় কুমড়ো ক্ষেত থেকে সুকণ্ঠে গান ধরল, 'যখন ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে বসে ধান কাটি, ও মোর মনে জাগে তার লয়ান দুটি' * তখন সেই গান শুনে 'বিপিন আবার অন্যমনস্ক হইয়া গেল। সেই দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ, বিল ও বিলের ধারে ধারে সবুজ জলি ধানের ক্ষেত, উপরে এবং নীচে নাচের ধরনে উড্ডীয়মান বাবুই পাখীর ঝাঁক, বিলের ধারের জলে শোলাগাছের হলদে ফুলের রাশি, হরিদাসপুরের বাঁশবনের মাথায় হেলিয়া-পড়া অস্তমান সূর্য, সব মিলিয়া তাহার মনে এক অপূর্ব ব্যথাভরা অনুভূতির সৃষ্টি করিল। যেন মনে হইল, মানীকে এ জগতে বুঝিবার ভালবাসিবার লোক নাই। মানী যাহার হাতে পড়িয়াছে, সে মানীর মূল্য বোঝে নাই। মানীর জীবনকে ব্যর্থতার পথ হইতে যদি কেহ রক্ষা করিতে পারে, তাহার মুখে সত্যকার আনন্দের হাসি

* গানের এই লাইন দু'টি দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্কেও আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নীলদর্পণের ঘটনাস্থল এবং বিভূতিভূষণের জন্মস্থান খুব কাছাকাছি। হয়তো এটি ওখানকার লোকপ্রচলিত কোন গান।

ফুটাইতে পারে, তবে সে বিপিন নিজেই। বিস্তীর্ণ সংসারে মানী হয়তো বড় একা, যেমন সে নিজেও আজ একা। সে মাত্র এইটুকু অনুভব করিল, মানী ছাড়া জগতে আর কেহ আজ যদি তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়ায় তাহার মনের এ শূন্যতা পূর্ণ হইবার নয়। . যে কোন কথাই সেই একটি মাত্র মানুষের কথা মনে আনিয়া দেয়—'

এ অবৈধ প্রেমে আকর্ষণের অতি-তীব্রতা নেই, প্রচণ্ড শিহরণ নেই, শিরায় শিরায় উন্মত্ত তাণ্ডব আবর্ত নেই। সারা বিশ্বের সঙ্গে এ প্রেম একাত্মতা এনে দেয়; প্রকৃতি ও মানুষকে নিয়ে যে জগৎ চোখের সমুখে পরিব্যাপ্ত সেই জগতের সঙ্গে প্রেমিকসত্তা একীভূত হয়ে যায়, সর্বত্র দেখে সে প্রিয়ার স্মৃতিস্বাক্ষর। এ প্রেম সমাজের বাঁধা খাতের বাইরে বয়েও প্লাবন আনে না উন্মত্ত পদক্ষেপে। এ প্রেম কোন অগ্নিকাণ্ড ঘটায়নি বিপিনের জীবনে বরং তার স্নিগ্ধ আলোকে 'বিপিনের মনের ঘুম ভাঙাইয়াছে মানী। সে সোনার কাঠি ছিল মানীর কাছে।'

সেই সোনার কাঠির ছোঁয়ায় বিপিন সব কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছে। মনের অন্ধকার ঘুচেছে তার। সকল অবনতি থেকে আত্মরক্ষা করে উন্নতির শীর্ষলোকে যাত্রা করছে সে। প্রেমের এই মহত্ব-বিধায়ক শক্তি সম্পর্কে বিভূতিভূষণ অত্যন্ত নিশ্চিত, এবং প্রেমের এ বিশিষ্টতা ঘোষণায় ক্লান্তিহীন। মানীর প্রেম বিপিনকে প্রজাপীড়নের পথ ছেড়ে আর্তসেবার পথে যেতে বলেছে। 'মানী তাহাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছে, যে পথে গেলে অর্থ ও পুণ্য দুইই মিলিবে। গরিব প্রজাদের প্রতি অত্যাচার করিয়া, তাহাদের রক্ত চুষিয়া তাহার বাবা এবং মানীর বাবা দুইজনেই ফুলিয়া ফাঁপিয়া মোটা হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা সে পাপ পথে চলিবে তো নাই-ই, বরং পিতৃদেবের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করিবে

নিজেদের দিয়া। মানী তাহাকে জীবনে আলো দেখাইয়াছে।' *

আর্তসেবার মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করাই শুধু নয়, মানীর প্রেম বিপিনকে তার দৈনন্দিন ছোটখাট সব বিচ্যুতি থেকেও রক্ষা করে। সামনাসামনি অনুপস্থিতি সত্ত্বেও মানী যেন তার বিবেক-রূপে তার মনোগহনে নিত্য আসীন। আজ একটু খেজুর-রস চুরি করে খেলেও বিপিন ভাঁড়ের মধ্যে পয়সা রেখে আসে। তার মনে হয়, 'চুরি সে করিতে পারিবে না। মানীর কাছে দাঁড়াইতে হইবে তাহাকে, চোরের বিবেক লইয়া দাঁড়াইতে পারিবে সেখানে?'

মানীর প্রেমের এই প্রভাব কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তার পরিচয় পাওয়া যাবে স্ত্রীর প্রতি বিপিনের ব্যবহারের পরিবর্তনে। যে স্ত্রীকে বিপিন কোনদিন ভালবাসেনি, তার প্রতিও একটা সদয় মমত্ববোধ জেগেছে তার এই প্রেমের প্রভাবে।

* প্রজাশোষণের বিরুদ্ধে লেখকের এই মনোভাব 'আরণ্যকে'ও বিক্ষিপ্তভাবে আছে। এই ধরণের আধুনিক যুগচিন্তার কিছু পরিচয় কতগুলি ছোট গল্পেও রয়েছে।
'কয়লা-ভাঁটা' (গল্প-পঞ্চাশৎ) গল্পে লেখক নিপুনভাবে স্বর্ণলোভী ব্যবসায়ীর মুখোস খুলে ধরেছেন; তারা কিভাবে শঠ উপায়ে সরল নির্বোধ কুলিদের শোষণ করে তারও চমৎকার চিত্র আছে গল্পটিতে। কিন্তু গল্পটি শেষ হয়েছে অত্যন্ত হতাশভাবে। লেখকের মনোভাবটা এমন যে এসব সরল নির্বোধ কুলিদের উন্নতিসাধন করা একেবারে অসম্ভব। এরা উপকারীকে বোকা ভাবে। (শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজে'র রমেশের অভিজ্ঞতা স্মরণীয়।) লেখক হতাশ হয়ে স্বর্ণলোভীদের জয়ধ্বনি দিয়ে গল্প শেষ করেছেন: 'যারা সত্যিই ঠকেছে এ ব্যাপারে তারা পরের পাঁচ ছ' দিন ধরে আমাকে দেখলেই হাসে, গা ঠেলাঠেলি করে পরস্পরের, যেন আমাকে তারা খুব বোকা বানিয়েছে। ... এ সরলা বঙ্গবালাদের আমি কি বোঝাব? দেবেন মাইতির জয় হোক, মাঠাবুরুর কয়লাভাঁটার মহাজন বলরামপুরের বিরিঞ্জলাল ঘনশ্যাম দাসের সাড়ে তেত্রিশ পার্সেন্ট মহাজনির জয় হোক।' (পৃঃ ১০৭)

অপু কঠোর দারিদ্র্যের সময় একটা ষ্ট্রাইকের জায়গার কাজ পেল। কিন্তু পরে ভাবল, 'ওরা একটা সুবিধা আদায় করবার জন্য ষ্ট্রাইক করেছে। দু'মাস তাদের ছেলে-মেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। তাদের মুখের ভাতের থালা কেড়ে খাবো শেষ কালে?' (পৃঃ ১৭২)

'বিপিনের সংসারে'র অন্যান্য প্রেম-সম্পর্কগুলির স্বাদ কমবেশী প্রায় একই রকম। বিশ্বেশ্বর প্রেমের জন্য সর্বস্বত্যাগী হয়েছে। কুলটা কামিনী গোয়ালিনীর প্রেমও লালসা বা বিলাস নয়, মৃত বিনোদ চাটুজ্যের স্মৃতির প্রতি তার মমতা এবং বিনোদ-পুত্র বিপিনের প্রতি তার প্রগাঢ় বাৎসল্য চরিত্রহীনা গোয়ালিনীকেও 'সূক্ষ্ম মানসিক স্তরে'র ঊর্ধ্বলোকে তুলে এনেছে। বীণা তার রুদ্ধ জীবনের হাহাকার বুকের মধ্যে চেপে রেখেছে, কোন অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে নিজের জ্বালাকে নিঃশেষে ভুলতে চায়নি।

শেষ জীবনের লেখা 'দেবযানে'ও এই 'স্বর্গীয়' প্রেমকে একেবারে স্বর্গলোকে স্থাপন করেই দেখবার চেষ্টা করেছেন বিভূতিভূষণ। তাঁর শেষ রচনা 'শেষ লেখা'-ও (কুশল পাহাড়ী) কামনাময় জীবন থেকে 'প্রজ্ঞা-বিমুক্তি' লাভের উপকথা।

সংক্ষেপে বললে, বিভূতিভূষণ প্রেমের যে-রূপ অনুভব করেছিলেন তা হচ্ছে শান্ত, স্নিগ্ধ, স্থূলত্ববর্জিত, কল্পনাজীবী, দেহহীন, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত, মহত্ব-বিধায়ক। বলা বাহুল্য, প্রেমের এটা এক দিককার রূপ। এই রূপের ঘোর তাঁর মনে মোহের সঞ্চার করত, প্রেমের আর অন্য কোন রূপ দেখতে দিত না। ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রেমের বিচিত্রতার সন্ধান করেননি তিনি, ভাবুক হিসেবে যে-প্রেমকে তিনি একতম বলে মনে করেছিলেন, তার সুর বাজিয়ে তোলাই তাঁর একতারার প্রয়াস।

উপসংহারে একটা কথা উল্লেখযোগ্য। সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে প্রেম-সম্পর্ককে পর্যবেক্ষণ করা আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যের বিশেষ ঐতিহ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক নবচেতনার প্রেক্ষাপটে আমাদের উপন্যাসের জন্ম।

সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসম্পর্কে'র যে রূপান্তর ঘটতে সুরু করেছিল, তার ছাপ উপন্যাসের জন্মক্ষণ থেকেই আছে।

নরনারীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক সামন্ততান্ত্রিক প্রথাবদ্ধতার স্তর অতিক্রম করে নতুন ধনবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্তরে উত্তরণের জন্য যে প্রচেষ্টা সুরু করেছিল, তার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ-মুখরিত পদক্ষেপটিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার প্রয়াস পেয়েছেন আমাদের কৃতী ঔপন্যাসিকরা—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। তাঁরা প্রেমসম্পর্কের নূতন ধরণটিকে ভাল করে বোঝবার ও বিচার করবার চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টার জের রবীন্দ্রোত্তর ঔপন্যাসিকদের মধ্যেও দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু বিভূতিভূষণ এই দৃষ্টি দিয়ে প্রেম-সম্পর্ককে দেখেননি। নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কের সমস্যা সম্বন্ধে বিভূতিভূষণ বিশেষ সচেতন ছিলেন না। প্রেম-অনুভূতির রোমান্টিক মাধুর্য তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য।

সামান্য দু' একটি ক্ষেত্রেই মাত্র এর ব্যতিক্রম বার করা চলে—যেখানে প্রেমে রোমান্টিক মাধুর্যের বদলে অন্য কোন বিষয় দেখা দিয়েছে। তবে এগুলি ব্যতিক্রম হিসেবেই মাত্র উল্লেখযোগ্য; সাহিত্যিক সাফল্যের স্বাক্ষর বা লেখকের মনোধর্মের ইঙ্গিত এগুলি বহন করে না। যেমন, 'অভয়ের অনিদ্রা' গল্পটিতে (গল্প-পঞ্চাশৎ) অভয়-বকুলের দাম্পত্য সম্পর্ক অভয়ের কার্পণ্য দ্বারা খণ্ডিত। বকুলের মৃত্যুতে যত না শোক সে পেয়েছে, তার চেয়ে অনেক বড় শোক পেয়েছে বকুলের সঙ্গে এক আনা সোনার দুল ভস্মীভূত হয়েছে বলে। আর স্ত্রী-বিহন সংসারে ঝির জন্যেও মাসে অন্তত দশটা টাকা ব্যয় করতে হবে, তার শোকই কি কম! সেই জন্য সারারাত অভয়ের ঘুম হোলো না। 'স্ত্রীর মৃত্যু সে সহ্য করিতে পারে! কিন্তু এই লোকসানের আঘাত সে ভুলিবে কেমন করিয়া। সারারাত্রি সে জাগিয়া বসিয়া রহিল। স্ত্রীর মৃত্যুতে কেন সে ভাগ্যবান হইল না?' (গল্প-পঞ্চাশৎ, পৃঃ ২৭৪)।

গল্পটিতে ঈষৎ ব্যঙ্গের ভাব আছে। সেদিক থেকেও গল্পটি উল্লেখ্য।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে ব্যঙ্গের স্থান নেই বললেই চলে। (আইনষ্টাইন ও ইন্দুবালা, উড়ুম্বর প্রভৃতি দু'একটি গল্প বাদে)। এই গল্পে লেখকের ব্যঙ্গ স্বল্প-অনুভূতি অভয়ের অতিরিক্ত অর্থপ্রিয়তার বিরুদ্ধে। এই ধরণের লোকের প্রতি লেখকের বিরাগ অতি স্পষ্ট, এবং তাঁর সাহিত্যের অন্যত্রও তা দুর্লক্ষ্য নয়। অভয়ের চরিত্রে প্রেমের রোমাণ্টিক মাধুর্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলেই লেখকের বিক্ষোভ ও ব্যঙ্গ।

ব্যতিক্রমের আরো দু' একটি স্বাক্ষর পাওয়া যাবে বিভূতিভূষণের ছোট গল্পে। (বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'ছোট গল্প' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। উপন্যাস তাঁর মূল ধারার বাহক, ব্যতিক্রমের নয়।

পঞ্চম অধ্যায়

অপূর্ব-চরিত-মানস

॥ এক ॥

॥ ভূমিকা ॥

উপন্যাস চরিত্রমুখ্য। কর্মলোক ও মনোলোকে মানুষ কেমন, সেই বিচিত্র রূপের পরিচয় দিতে চায় উপন্যাস। সেদিক থেকে উপন্যাস-সাহিত্য এক বিরাট চরিত্র-প্রদর্শনী। এর বিরাটত্ব শুধু সংখ্যায় নয়, বৈচিত্র্যে এবং ব্যক্তিস্বকীয়তায়।

এই প্রদর্শনশালায় বিভূতিভূষণের দান সংখ্যার দিক দিয়ে স্বল্প নয়, কিন্তু বিচিত্রতার দিক থেকে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাঁর প্রধান নায়ক-চরিত্রগুলিকে একটু নজর করে দেখলে এই কথার সত্যতা বোঝা যাবে। তারা প্রায় সকলেই কল্পনাপ্রবণ, ভাবুক, প্রকৃতি-প্রীতিসম্পন্ন, সংবেদনশীল এবং মোটামুটিভাবে রোমান্টিক প্রকৃতির। শিশু-কিশোর-যুবক অপু নিশ্চয়ই এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। কিন্তু আদর্শ হিন্দু হোটেলে রন্ধনরত পাচক ব্রাহ্মণ হাজারী ঠাকুর, সন্ন্যাসী-গৃহী ভবানী বাঁড়ুজ্যে, বা জমিদারী সেঁরেস্তার কর্মচারী বিপিনও এর ব্যতিক্রম নয়। শিক্ষাদীক্ষা ও পরিপার্শ্বের তারতম্য আছে। কিন্তু তা সবটুকুই বাইরের, ভেতরে এরা এক। এদের সম্পর্ক দূর জ্ঞাতি-সম্পর্কও নয়, একই ব্যক্তির বিভিন্ন বেশবিন্যাস মাত্র। অনেক কাঁচা অভিনেতা যেমন বিভিন্ন পোষাক পরে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেও নিজেদের ব্যক্তিভঙ্গি বর্জন করতে পারে না, বিভূতিভূষণও তাঁর বিশেষ মানসভঙ্গি বর্জন করেননি তাঁর চরিত্রগুলিতে। ফলে তারা যে নামেই দাঁড়াক, দেখা যায় বিভূতি-

ভূষণকে। ঐ কাঁচা অভিনেতার অভিনয়ের প্রথম দৃশ্যেই যেমন দর্শক বলে ওঠে, 'ঐ অমুক অভিনেতা', ভূমিকার কথাটা ভুলে যায়, তেমনি এই চরিত্রগুলোর ব্যাপারেও পাঠক সেই বিশেষ চরিত্রকে দেখে না, দেখে বিভূতিভূষণ ঐ চরিত্র মারফত নিজের রস-পিপাসা কেমন ভাবে চরিতার্থ করছেন। অন্য ঔপন্যাসিক মানুষের চরিত্র-বৈচিত্র্যের সীমাহীনতাকে উদ্‌ঘাটিত করতে ব্যস্ত—সেখানে তারা বৈজ্ঞানিক; বিভূতিভূষণ নিজের বিশিষ্ট মনকে প্রকাশিত করতে ব্যস্ত—তিনি আত্মমুখী ভাবুক। এই আত্মপরায়ণ কল্পনাশক্তি বাহ্যজগতের বিচিত্র মানুষকে প্রকাশ করেনি, স্বীয় আন্তর জগতের এক এবং অদ্বিতীয় পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছে।

এই জন্যে অপু-জিতুই মাত্র 'সূক্ষ্ম মানসিকতা'র অধিকারী নয়, প্রায় প্রতিটি পুরুষ চরিত্রই তাই। নিজের হোটেল হলে হাজারী ঠাকুর কি কি সুন্দর ব্যবস্থা করবে, তার স্বপ্নময় কল্পনা রচনা করে পাচক-ব্রাহ্মণ। বিপিন বৈদেহী প্রেম সম্পর্কে সূক্ষ্ম চিন্তা করতে পারে, প্রকৃতি-সৌন্দর্যে অভিভূত হয়; যে বৌকে সে ভাল বাসে না, তার সম্পর্কেও সংবেদন-শীলতার অভাব নেই তার।

এরা উপন্যাসের নায়ক। এদের পাশেই যদি মিলিয়ে দেখা যায় 'তৃণাঙ্কুর,' 'স্মৃতির রেখা' প্রভৃতি ডায়রীর নায়ককে, তবে চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে কোন পার্থক্য লক্ষিত হবে না দুই শ্রেণীর নায়কে। আর আরণ্যক—যেটিকে ডায়রী নয়, উপন্যাস বলে আগেই চিহ্নিত করেছেন, বিভূতিভূষণ সেই গ্রন্থের 'আমি' নামক চরিত্রটি লেখক না নায়ক? নিঃসন্দেহে উভয়ই।

এই আত্মমুখী ভাবুকতার জন্য বিভূতিভূষণের মানুষে এ-কালীন অস্থিরতা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, অর্থলোভ নেই, যশ মান প্রতিপত্তির উচ্চাকাঙ্খা নেই। তারা তুচ্ছ ক্ষুদ্র সরল সাধারণ জীবনের মধ্যে পরম ঐশ্বর্যকে আবিষ্কার করেছে। তারা সেই বাদশাজাদার মত জেনেছে যে

স্বর্ণাভরণের চেয়ে কুসুমাভরণের মূল্য বেশী—তারা প্রলোভনের ঊর্ধ্বে।

এই আত্মপরায়ণতার জন্যই তাঁরা সাহিত্যে রুদ্র চরিত্র নেই। প্রকৃতির রুদ্ররূপে তাঁর অনাসক্তি, মানুষেরও চণ্ডরূপে তাঁর অনাগ্রহ। তাঁর 'ভিলেন' বড় জোর আরণ্যকের সেই পিকনিক-পার্টি, যারা অরণ্যে এসেও প্রকৃতির দিকে না তাকিয়ে শুধু খাদ্যের দিকেই তাকিয়ে ছিল। রাজারাম রায় (ইছামতী), রাসবিহারী সিং (আরণ্যক) বা নন্দলাল ওঝা (আরণ্যক) প্রভৃতি চরিত্রগুলির ভিলেন হিসেবে যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু লেখক সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেননি, বরং ঘৃণাভরে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিয়েছেন।

সব্‌জেকটিভ্‌ চিন্তা শরৎচন্দ্রের চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রবল; তাঁর অধিকাংশ পুরুষ চরিত্রগুলিই প্রায় এক—আত্মভোলা, উদাসীন, নিষ্ক্রিয়। রবীন্দ্রনাথেরও উপন্যাসে নারী-চরিত্রগুলি দুই-নারী-তত্ত্বের বাইরে বড় একটা যেতে চায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রাঙ্কনেও সব্‌জেক্‌টিভ্‌ চিন্তা অনুপস্থিত নয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে বঙ্কিমে তবু অব্‌জেক্‌টিভ্‌-ভিত্তিতে চরিত্র অঙ্কনের প্রয়াস আছে, যে জন্যে তাঁর চরিত্রে কিছুটা বৈচিত্র্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথে এর চেয়ে কম। শরৎচন্দ্রে এই প্রয়াস অত্যন্ত স্বল্প। বিভূতিভূষণে আরো কম। বাংলাসাহিত্যের চরিত্রসৃষ্টিতে বৈচিত্র্যের অভাব ঘটবার এটি একটি প্রধান কারণ—এই অতিরিক্ত সব্‌জেক্‌টিভ্‌ চিন্তা।

বিভূতিভূষণ তাঁর গ্রন্থে এমন লোক সাধারণত নির্বাচন করতে চান যা তাঁর মনোভঙ্গির সঙ্গে খাপ খায়। এই নির্বাচন-কুশলতার জন্য তাঁর চরিত্রগুলি বিভূতিভূষণের মনের ছাপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও বিশেষ একটা মাটির রূপ-রস-গন্ধ থেকে বিচ্যুত হয় না। চরিত্র-নির্বাচনের এই কৌশলে তিনি সবজেক্‌টিভ-অব্‌জেক্‌টিভের দ্বন্দ্ব অনেকটা এড়িয়ে গেছেন, যে দ্বন্দ্ব বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরতের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশী।

চরিত্রক্ষেত্রে বিভূতিভূষণের বৈচিত্র্য নেই, কিন্তু নানা নামে যে একটি

মানুষকে তিনি দেখাতে চেয়েছেন তার মৌলিকতা অনস্বীকার্য। এ কালের একজন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক, সমারসেট মম বলেছেন যে, সাহিত্যে মৌলিক চরিত্রের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প; খাঁটি মৌলিক চরিত্র সৃষ্টির চেয়ে কঠিন কাজ আর কিছু নেই। তাঁর মতে যে কোন লেখক একটিমাত্র সঠিক মৌলিক চরিত্র সৃষ্টি করেও কালজয়ী হতে পারেন। উদাহরণ দিয়েছেন ডন কুইক্সোটের চরিত্র (Ten Novels and Their Authors, Introduction)। বিভূতিভূষণও অ-পূর্ব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, সে-গৌরব তাঁর প্রাপ্য।

মম্ ঐ প্রসঙ্গেই বলছেন যে, তাঁর ধারণা জলজ্যান্ত কোন মানুষের মডেল সামনে না দেখলে মৌলিক চরিত্র সৃষ্টি দুরূহ, প্রায় অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে জীবন্ত একটি মডেল বিভূতিভূষণ পেয়েছিলেন, সে-মডেল তিনি স্বয়ং।

নিজের চরিত্রকে রূপায়িত করবার প্রধান বাধা আত্মসচেতনতা। এটিকে তিনি অতিক্রম করেছেন প্রধানত দুটি পথে। প্রথমতঃ 'আরণ্যক' ছাড়া কোথাও 'আমি' নেই। ফলে পরোক্ষে অন্যের জবানীতে নিজের কথা বলা গেছে। অন্য নামের চরিত্রগুলিই আবরণের কাজ করেছে; তাঁকে সচেতন হয়ে পড়তে হয়নি। দ্বিতীয় উপায় তাঁর আত্মভাবমুগ্ধ লিরিক্যাল মন। এই ভাবতন্ময়তার মুহূর্তে সচেতনতা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে যায়, এবং লেখক চোখ বুঁজে মনের গভীর থেকে মণি-মুক্তা সংগ্রহ করে আনেন। তাঁর লেখার ষ্টাইল্-ই ভাবতন্ময়—এক অতল স্মৃতির সাগরে মন যেন মৃদু লয়ে রোমন্থনে ব্যাপৃত।

বিভূতিভূষণের নারীচরিত্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁদের স্নিগ্ধ মাতৃত্ব। স্নেহপরায়ণ মাতৃত্বই এই চরিত্রগুলির মূল উপাদান। সরল মমতাময়ী, সংসারী, দ্বন্দ্বহীনা, একনিষ্ঠা বাংলাদেশের মেয়ে তাঁর উপন্যাসের চিরন্তনী নায়িকা। পরিপার্শ্ব-ভেদে বাহ্য সাজ-পোষাকের কিঞ্চিৎ

তারতম্য থাকলেও ভেতরে তারা এক। সর্বজয়া-অপর্ণা থেকে তিলু পর্যন্ত সকলেই এর সাক্ষ্য দিতে পারে। 'বল্লালী-বালাই' পর্বে ইন্দির ঠাকরুণের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহারটুকু সর্বজয়াকে কিঞ্চিৎ বিশিষ্টতা দিয়েছে। অপর্ণাকে তো ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন সর্বজয়ারই 'একটা তরুণ সংস্করণ—সেবানিপুণতা, মঙ্গলাকাঙ্খা, গৃহস্থালীর কল্যাণ-সাধন, দুঃখে সহানুভূতি, একটু মৃদু কৌতুকমণ্ডিত হাস্য-পরিহাস এ সমস্ত বিষয়েই তাহার মাতা ও স্ত্রী এক।' লীলা তার আধুনিক শিক্ষা আভিজাত্য ও মর্মান্তিক মৃত্যু সত্ত্বেও এদেরই দলের মেয়ে। এমন কি বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুলটা-চরিত্রগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। তারাও সবাই 'সতী-সাধ্বী', একনিষ্ঠ, এবং স্নিগ্ধ সারল্যের প্রতীক, 'ইছামতী'র গয়ামেম থেকে 'বিপিনের সংসারে'র অবৈধ প্রেমের একাধিক নায়িকারা সর্বজয়া-অপর্ণা-তিলুর সঙ্গে সমাজে যত ব্যবধান রেখেই বসুক না, মনের ক্ষেত্রে তাদের আসন খুব দূরে নয়।

তাঁর এই সকল নারীচরিত্রের এই সমধর্মিতার কথা বিভূতিভূষণও হয়ত বুঝতেন, এবং অপুর জবানীতে একবার তার কারণ বিশ্লেষণও করবার চেষ্টা করেছেন: 'সে (অপু) এই মঙ্গলরূপিণী নারীকেই সারাজীবন দেখিয়া আসিয়াছে—এই স্নেহময়ী করুণাময়ী নারীকে—হয়ত ইহা সম্ভব হইয়াছে এই জন্য যে, নারীর সঙ্গে তার পরিচয় অল্পকালের ও ভাসা-ভাসা ধরণের বলিয়া—অপর্ণা দুদিনের জন্য তার ঘর করিয়াছিল—লীলার সহিত যে পরিচয় তাহা সংসারের শত সুখ ও দুঃখ ও সদাজাগ্রত স্বার্থদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া নহে—পটেশ্বরী, রানুদি, নির্মলা, নিরুদি, তেওয়ারী বধূ—সবই তাই।' (অপরাজিত, চতুর্থ সংস্করণ পৃঃ ৩৯৮)।

কিন্তু অপু (তথা বিভূতিভূষণ) এতেই খুশী; নারীর অন্য কোন রূপ সে দেখতে চায় না, পাছে কোন মালিন্য দেখতে হয় এই তার ভয়. আর ভয় বন্ধনের। ঐ প্রসঙ্গেই অপু বলেছে,...'অপু

দুঃখিত নয়—তাই ভালো; এই স্রোতের শেওলার মত ভাসিয়া বেড়ানো ভবঘুরে পথিক-জীবনে সহচর-সহচরীগণের যে কল্যাণপাণি ক্ষুধার সময় তাহাকে অমৃত পরিবেশন করিয়াছে—তাহাতেই সে ধন্য, আরও বেশী মেশামিশি করিয়া তাহাদের দুর্বলতাকে আবিষ্কার করিবার সখ তাহার নাই—সে যাহা পাইয়াছে, চিরকাল সে নারীর নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে ইহার জন্য।' (অপরাজিত, পৃঃ ৩৯৯)

'পথের-পাঁচালী' ও 'অপরাজিতে'র নারীচরিত্রগুলিতে এই কৃতজ্ঞতার ঋণ-শোধের প্রয়াস অত্যন্ত স্পষ্ট, পরের রচনাগুলিতেও দুর্লক্ষ্য নয়। তার কারণ বিভূতিভূষণের মন বদলায়নি, তিনি অপু-পর্বে যা ছিলেন, বরাবরই তাই রয়ে গেছেন।

আর লক্ষণীয়, মুখ্যত নারীচরিত্রের কথা বলতে গিয়েও 'সহচর'-দের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ বিভূতিভূষণের 'পথিক-জীবনে' সহচরদের সঙ্গেও পরিচয়টা 'ভাসা-ভাসা ধরণের' এবং তাদের কাছ থেকে অমৃত পেয়ে তিনি ধন্য, আরও বেশী মেশামেশি করে তাদের দুর্বলতাকে আবিষ্কার করবার সখ তাঁর নেই।

মানুষের গভীর ও বহুমুখী পরিচয় পেতে হলে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে হয়। কিন্তু তাতে নির্জনতা-প্রেমিক বিভূতিভূষণের অনিচ্ছা। তিনি বন্ধনভীরু পথিক, ঘনিষ্ঠতার বাঁধন সম্পর্কে প্রতি মুহূর্তে তাঁর আশঙ্কা ; তাই তিনি কোন মানুষের সঙ্গে ত্রিরাত্রি বাস করে তার আত্মজন হয়ে যেতে চান না। সেই আত্মীয়তা তাঁর সুদূর-পিয়াসী প্রাণবিহঙ্গকে শৃঙ্খলিত করতে পারে, এই তাঁর ভয়। অপু বিবাহকে ভাবে 'সোনার শিকল' (অপরাজিত, পৃঃ ১৮৮), 'সকল প্রকার বন্ধনকে সে ভয় করে।' (ঐ, পৃঃ ১৮০)। এ বন্ধনভীতি শুধু অপুর নয়, বিভূতিভূষণেরও।

দ্বিতীয়ত, তিনি মানুষের কোন মালিন্য দেখতে চান না, তাতে তাঁর সৌন্দর্য-পিপাসু মন আঘাত পায়। কিন্তু এই আঘাত থেকে মনকে বাঁচানো যাবে কি করে—কোন মানুষই তো নিরঙ্কুশ মালিন্যমুক্ত নয়।

তাই লেখক ঐ 'ভাসা-ভাসা' পরিচয়ের অমৃতে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করে মনের সৌন্দর্য-পিপাসাকে তৃপ্ত করতে চান এর চেয়ে কোন বেশী পরিচয় তাঁর কাম্য নয়।

চরিত্র আলোচনায় যে detachment লেখকের কাছে কাম্য তার অভাব আছে বিভূতিভূষণে। তাঁর স্বীয় মনের মাধুরীর গুরুত্ব এতটা বেশী করে রয়েছে বলেই তাঁর নারী ও পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। স্নিগ্ধ, সরল, unsophisticated, দ্বন্দ্বহীন উভয়েই।

একটি জায়গায় মাত্র তাঁর নারী ও পুরুষের পার্থক্য আছে। সেটিও এসেছে বিভূতিভূষণের পরস্পর বিরোধী দুই মনোবৃত্তি থেকে। তাঁর মনের সুদূর-তৃষ্ণা (ও সেই সঙ্গে প্রকৃতিপ্রীতি) পুরুষ চরিত্রে প্রবল; এই তৃষ্ণা নারীচরিত্রগুলিতে নেই; তারা গৃহগতপ্রাণ, গৃহের স্নেহ-মমতা ও সংসারকল্যাণ তাদের কাম্য, তারা সংসারী ধরণের গুছোনো মানুষ।

বিভূতিভূষণের সুদূর-তৃষ্ণা তাকে যেমন গৃহের বাইরে এনে ফেলত, তেমনি তাঁর সংবেদনশীল মনে ঘরের ছোটখাট স্নেহ-ভাল-বাসার বিচিত্র ঐশ্বর্যের প্রতি আকর্ষণও ছিল যথেষ্ট। নিজের এই পরস্পর-বিরোধী দুটি মনোবৃত্তি যেন লেখক সমভাবে বণ্টন করে দিয়েছেন দু' ধরনের চরিত্রে—পুরুষে ও নারীতে। আর লেখকের নিজের মধ্যে যেমন এই দুটি মনোভাব মাঝে মাঝে আপোষ করেছে, চরিত্রগুলিরও কোন কোনটির মধ্যে দেখি তাই। হরিহর দশ বছর দেশান্তরী থাকবার পর সংসার পেতেছে, ভবানী পেতেছে পঞ্চাশ বছর বয়সে; গৃহবিবাগী সত্তা স্নেহের নীড়ে ডানা গুটিয়ে আপোষ করছে। আর তিলু স্বামীর হাত ধরে বৃহৎ জীবনের একটু তৃষ্ণা যেন সামান্য পরিমাণে অনুভব করেছে। দুই প্রবাহ পরস্পরের সঙ্গে মিশেছে এই সঙ্গমগুলিতে। দুই বিরোধী ধারা হয়তো অন্য লেখকের মনে তীব্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু

বিভূতিভূষণ দ্বন্দ্বকে প্রতি মুহূর্তে এড়িয়ে একটা সামঞ্জস্যের মধ্যে জীবনকে ধরতে চান। তাঁর এই মনোবৈশিষ্ট্যের চিহ্ন এই চরিত্রগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে।

বিভূতিভূষণ তাঁর মনকে সমভাবে বণ্টন করে তাঁর নারী ও পুরুষ চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন—তাঁর সকল চরিত্র-প্রবাহের উৎস অর্ধনারীশ্বর বিভূতিভূষণের মানস-সরোবর।

'বর্ণিত নায়ক-নায়িকার পিছনে শিল্পী তার আবাল্য-দীর্ঘ জীবনের সকল সুখদুঃখ হাসিকান্না নিয়ে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন।' (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ৪১)।—বিভূতিভূষণের এই উক্তির মধ্যে এ বক্তব্যের সমর্থন রয়েছে।

বিভূতিভূষণের কল্প-আদর্শের আলোক নারীচরিত্রের উপর পড়ে যে স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময় রূপ পরিগ্রহ করত, তার উদাহরণ সমগ্র বিভূতি-সাহিত্যেই বর্ত্তমান। এখানে একটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। সেটা থেকেই তাঁর মনোভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাবে। এ উদাহরণটিতেও অপুর মাধ্যমে বিভূতিভূষণকে দেখতে হবে।

অপর্ণাকে দেখে 'অপুর মনে হইল দু-একখানা প্রাচীন পটে আঁকা তরুণী দেবীমূর্ত্তির, কি দশমহাবিদ্যার ষোড়শী মূর্ত্তির মুখে এ ধরনের অনুপম, মহিমময় স্নিগ্ধ সৌন্দর্য সে দেখিয়াছে। একটু সেকেলে, একটু প্রাচীন ধরনের সৌন্দর্য—সুতরাং দুষ্প্রাপ্য। যেন মনে হয় এ খাঁটি বাংলার জিনিষ, এই দূর পল্লীপ্রান্তরের নদীতীরের সকল শ্যামলতা, সকল সরসতা, পথিপ্রান্তে বনফুলের সকল সরলতা ছানিয়া এ মুখ গড়া, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাংলার পল্লীর চূত বকুল-বীথির ছায়ায় ছায়ায় কত অপরাহ্নে নদীঘাটে যাওয়া-আসার পথে এই উজ্জ্বলশ্যামবর্ণা রূপসী তরুণী বধূদের লক্ষ্মীর মত আলতারাঙা পদচিহ্ন কতবার পড়িয়াছে, মুছিয়াছে, আবার পড়িয়াছে। ইহাদেরই স্নেহপ্রেমের, দুঃখ সুখের কাহিনী, বেহুলা লক্ষীন্দরের গানে, ফুল্লরার বারমাস্যায়, সুবচনীর ব্রতকথায়, বাংলার বৈষ্ণবকবিদের

রাধিকার রূপবর্ণনায়, পাড়াগাঁয়ের ছড়ায় উপকথায় সুয়োরাণী দুয়োরাণীর গল্পে।' (অপরাজিত, পৃঃ ১৮৯)।

দেবীমূর্ত্তির মহিমময় স্নিগ্ধ সৌন্দর্য, নদীতীরের শ্যামলতা, বনফুলের সরলতা বিভূতিভূষণের প্রায় সব নারীরই আত্মার ভূষণ। আর মৃত্যুবিজয়িনী বেহুলা, ব্যাধরমনী ফুল্লরা, প্রেমিকা রাধিকা প্রভৃতি যত আলাদা ধরনের নারীই হোক না কেন, বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে এরা প্রায় সবাই এক।

শিশুর প্রতি মনোযোগ বিভূতিভূষণের অত্যন্ত বেশী। অন্য কোন বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক তাঁদের সাহিত্যে শিশুকে এত গুরুত্ব দেননি। 'পথের পাঁচালী' সারা বইটাই একটি শিশু-লীলার কাব্য। এই সবান্ধব অপু-দুর্গা ছাড়াও আছে কাজল (অপরাজিত), জিতু (দৃষ্টিপ্রদীপ), খোকা (ইছামতী) ইত্যাদি। তাঁর ছোটগল্পেও শিশুর যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব। তাঁর সাহিত্য এক বিরাট শিশুমেলা।

এই শিশুরা অধিকাংশই গৌণ চরিত্রে দাঁড়িয়ে নেই। বরং বহুস্থানে এরাই মুখ্য, এদের নিয়েই কাহিনী।

সাধারণত উপন্যাস সাহিত্যে শিশুর আবির্ভাব ঘটে অল্প। এবং সেইটা হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ সাহিত্যের এ ধারায় জীবনের যে গতিবেগকে পরিমাপ করবার চেষ্টা করা হয়, তাতে শিশুর প্রত্যক্ষ সক্রিয় ভূমিকা নেই। সে জীবন-গতির ফলটা অবোধভাবে ভোগ করে মাত্র। সুতরাং উপন্যাস-সাহিত্যে শিশুর বৃহৎ ভূমিকা থাকতে পারে না। কিন্তু বিভূতিভূষণের উপন্যাসের উপজীব্য জীবনচাঞ্চল্য নয়, মানসস্বপ্ন। শিশুমন এই স্বপ্নের যত সুষ্ঠু বাহন হতে পারে, তত আর কোন মন নয়। শিশু যত বড় হয়, তত সে তার এই স্বপ্নকে হারিয়ে ফেলে, তত তার তৃতীয় নেত্রের দৃষ্টিপ্রদীপের আলো ক্ষীণ হতে থাকে, এবং বিভূতিভূষণের

মনোযোগও সেখান থেকে তত কমতে থাকে। (যাঁরা বয়স্ক হয়েও মনের এই গুণ বজায় রাখতে পারেন, তাঁদের ক্ষেত্রে অবশ্য থাকে।)

এমন কি যে শিশুর মনে স্বপ্ন দেখার মত বোধও ভাল করে জন্মায় নি, যার মুখে অস্ফুট কাকলির বেশী ভাষা ফোটে নি, এমন শিশু সম্পর্কেও বিভূতিভূষণের আগ্রহ প্রচুর। এই ধরনের শিশুকে সাধারণ উপন্যাস-সাহিত্যে প্রায় গ্রহণই করা হয় না। কারণ সাহিত্যের এই ধারা চরিত্রমুখ্য, অথচ এই মানবকের মধ্যে তখনও চরিত্র বস্তুটা দানা বেঁধে ওঠে নি। সে তখন একতাল অস্ফুট চেতনা মাত্র, আকার-প্রকার তার অনির্দিষ্ট। কিন্তু বিভূতিভূষণ এমন মানব-সন্তানগুলিকেও সমাদরে উপন্যাসের পাতায় বসিয়ে তাদের অকারণ মুখভঙ্গি ও অর্থহীন মুখভাব দেখে-শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। এই ধরনের শিশুর ভাল উদাহরণ হবে 'ইছামতী'-র খোকা। তাঁর অন্যান্য গল্প-উপন্যাসেও এ জাতীয় চরিত্র আছে।

'ইছামতীর' খোকা অনেকগুলি পাতা জুড়ে একই ধরণের আধভাঙ্গা কথা বকে যাচ্ছে, কিন্তু তাকে বারবার আনতে লেখকের শ্রান্তি নেই। অগঠিত-চরিত্র বলে অন্য ঔপন্যাসিকের কাছে এ জাতীয় শিশু অপাংক্তেয়, আর ঠিক ঐ কারণেই বিভূতিভূষণের কাছে এরা এত সমাদরের।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শিশু প্রকৃতির সৃজন। কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুলপরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা।' (ছেলে-ভুলানো ছড়া, লোক-সাহিত্য) এই রচনায় মানুষের নীচতা, ক্ষুদ্রতা ও মালিন্যের ছাপও যথেষ্ট পড়ে। আর প্রকৃতি বিভূতিভূষণের কাছে মালিন্যহীন অকলঙ্ক সৌন্দর্যের আধার। মানুষ ও প্রকৃতির এই স্বভাব-বৈপরীত্য সম্পূর্ণভাবে অবসিত হয় শিশুর ক্ষেত্রে। সে মানুষ হয়েও 'প্রকৃতির সৃজন।' সে মালিন্যজাত, কিন্তু সুন্দর। সে মানুষের কোলেই জন্মেছে, কিন্তু প্রকৃতির কোল ছেড়ে আসে নি। শিশুর মধ্যে মানুষ ও প্রকৃতি তাদের বিরোধ ভুলে সানন্দে সম্মিলিত। এইজন্যই

শিশু বিভূতিভূষণের কাছে এত প্রিয়।

বয়স্কদের মধ্যেও গ্রামীণ, আরণ্য এবং আদিবাসীদের প্রতি তাঁর ঝোঁক। কারণ এরা প্রকৃতির অনেক কাছের মানুষ। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের প্রাচীন শিশু-মানবের সগোত্র হচ্ছে অরণ্যবাসীরা। 'আরণ্যকে' এবং কতগুলি গল্পে এদের প্রতি লেখকের ভালবাসা সরবে ঘোষিত।

ডায়রীগুলিতে যেখানে যেখানে বিভূতিভূষণ কি নিয়ে লিখবেন ভেবেছেন তার প্রায় সর্বত্রই তিনি দুটি বিষয়ে তাঁর পক্ষপাতিত্ব ঘোষণা করেছেন। এক, প্রকৃতিজগৎ; দুই, শিশু। তিনি লিখতে চান, 'আমার শৈশব কি রকম কাটল?' (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ৪১)। শুধু লেখা নয়, আবার নতুন করে শৈশব জীবনে ফিরে যাওয়ারও আশা করেন তিনি। এ জন্মে না হলে আগামী জন্মে। 'যে যাই ভাবুক আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি—শুধু বিশ্বাস বলে নয়—যেন দেখতেও পাই, হাজার হাজার বছর পরে ঐ আমার শৈশব-আনন্দ-ভরা ভিটার মত আর কোন দেশে জন্মে অপূর্ব আনন্দভরা শৈশব যাপন করব—পৃথিবী মায়ের বুকে নতুন হয়ে ফিরে আসব।' (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ৯২)।

যতদিন পর্যন্ত না সেই ভাবী জন্মান্তরের শৈশব-নন্দনকাননে গিয়ে পেঁছনো যাচ্ছে, ততদিন তো একেবারে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয়। তাই স্মৃতির রোমন্থন ছাড়াও নানা পথে তিনি শৈশবে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর শিশু চরিত্রগুলিতে প্রায় সর্বত্রই এই চেষ্টার ছাপ।

অনেকের কাছে শৈশব নিয়ে এত মাতামাতি অর্থহীন মনে হতে পারে। প্রশ্নটা বিভূতিভূষণ নিজে তুলে উত্তরও নিজেই দিয়েছেন। প্রশ্নটা 'এই রকম করে বলা যেতে পারে—শৈশব তো সকলেরই হয়—ওতে ভাববার কি আছে! এ আর নতুন কথা কি?' উত্তর দিচ্ছেন, 'তা নয়। এই ভেবে দেখাটাই আসল। না ভাবলে ভগবানের সৃষ্টি মিথ্যা হয়ে পড়ে। জগতে যে এত সৌন্দর্য তার সার্থকতা তখনি যখন মানুষ তাকে বুঝবে, গ্রহণ করবে, তা থেকে আনন্দ পাবে।' (স্মৃতির

রেখা, পৃঃ ৪৩)। আর এই সার্থকতা শুধু সৌন্দর্য-বস্তুর নয়, সৌন্দর্য ভোক্তারও। অস্তমান সূর্য, পাখীর গান, খোকাখুকির হাসি এই সবের 'আনন্দকে সে ভোগ করে নিয়ে নিজেও বড় হয়ে উঠল—আত্মাকে আর এক ধাপে উঠিয়ে দিলে।' (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ৪৩)।

আত্মার উন্নতির সহায়ক শিশুকে (এবং প্রকৃতিকে) বিভূতিভূষণ ক্রমে প্রায় দেবতার বা গুরুর আসনে বসিয়েছেন। 'অজস্র পাপ ক্ষুদ্রতা ও লোভে যে পৃথিবী ক্লেদাক্ত' তার অনেক উর্ধে 'বিরাট বিশ্বযন্ত্রের লয়-সঙ্গতির একটা মনোমুগ্ধকর তান' এই শিশু। (ইছামতী, পৃঃ ৩০৭)। ঐ 'ইছামতীর'ই অন্যত্র বলেছেন, 'এই শিশু, এই নদীতীর সেই তত্ত্বেরই (অর্থাৎ ভগবৎ-তত্ত্ব) অন্তর্ভুক্ত জিনিষ। সে থেকে পৃথক নয়—সেই মহা-একের অংশ মাত্র।' (পৃঃ ৩৫৮)। 'চোখ থাকলে দেখা যাবে, ওই ফুলে, পাখীর ডাকে, ছেলেমানুষের হাসিতে তিনি রয়েছেন।' (পৃঃ ৩৭৪)

'ইছামতী'-তে কবিরাজ বল্লেন, 'তাহলি দাঁড়াচ্ছে এই খোকা আপনার এক গুরু।' ভবানী কথাটা প্রায় স্বীকার করে নিয়ে বল্লেন,—'যা বলেন।'

ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির শিক্ষকতা-গুণের কথা বলেছেন। আর ছ' বছরের শিশুকে বলেছেন, 'mighty prophet, seer blest,।'

বিভূতিভূষণের শৈশব-প্রত্যাবর্তনের আকূতিও পূর্বসূরীদের চিন্তায় দুর্লক্ষ্য নয়। রুসো-উদ্বুদ্ধ রোমান্টিক আন্দোলন পর্যালোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক আরভিং ব্যাবিট এই বিষয়েরও উল্লেখ করেছেন। (দ্রষ্টব্য—Rousseau and Romanticism)। অধ্যাপক ব্যাবিট অবশ্য অনুরূপ চিন্তার সাদৃশ্য সন্ধানে দূর-অতীত পর্যন্ত গিয়েছেন। চীনের আদি তাও-বাদীদের জীবনাদর্শ প্রকৃতিমুখী ও শিশুমুখী। তারাও জীবনকে প্রকৃতি-লালিত শৈশব-সারল্য থেকে সুরু করতে চায়। তাও-বাদ "encourages a reversion to origins, to the state of nature and the simple life. (পৃঃ ২৯৭)। তাওবাদীদের মতে

নীহারবাবুর যা মনে হয় তা এই।

অপুর জীবনের যা idealism তা নিয়ে দ্বন্দ্ব, আদর্শবিভ্রাট তার জীবনে অনেকবারই ঘটেছে। দ্বন্দ্ব শুধু তার দারিদ্র্যের সঙ্গেই নয়, সে অভিজ্ঞতাই তার একমাত্র অভিজ্ঞতা নয়। সেই যে অপর্ণার মৃত্যুর পর কোথায় এক গ্রামে নিতান্ত ইতর এক সমাজের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল স্কুল মাষ্টার হয়ে—সেখানে তার আত্মার তার আদর্শের চরম মৃত্যু ও অপমান যা হয়েছিল—কি যে সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব, আদর্শের সঙ্গে বিরোধ। সেখান থেকে তো নিজেই নিজকে সে উদ্ধার করল। তারপর সেই যে একবার কোথায় ষ্ট্রাইকের সময় চাকরী নিয়েছিল নিতান্ত দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে—তারপর যখন মনে হল সে একজনের আদর্শের বিরুদ্ধে গিয়ে তার মুখের অন্ন কেড়ে নিচ্ছে, তখন তার মনে আদর্শের সঙ্গে বিরোধ জেগেছিল বই কি! এরকম...ঘটনার তো অভাবই নেই। আর অন্তর্দ্বন্দ্বের কথাই যদি বলতে হয়, তাহলে সবচেয়ে যা বড় দুঃখ, বড় দ্বন্দ্ব, বড় অভাব—সেই যে অন্তরাত্মার নিঃসঙ্গতা—বন্ধু নেই, বান্ধব নেই, আপনার বলতে কেউ নেই, তার আদর্শের সমর্থক নেই, নেই সহায়ক—এই যে ভীষণ একাকীত্ব-বোধ এর দুঃখকষ্ট যে দারিদ্র্যের চেয়েও ভীষণ এবং এই অন্তরাত্মার নিঃসঙ্গতার দুঃখ, তাকে যে কি রকম পীড়ন করেছে, এবং তার অভিজ্ঞতা অপুর যে কি নিদারুণ, তা যদি কারুর উপলব্ধিকে, সহানুভূতিকে স্পর্শ করে না থাকে, তবে তার সাহিত্যালোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। এর চেয়ে নিষ্করুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব আর কি আছে?"

এইখানেই নীহারবাবুর অভিযোগ-খণ্ডন পর্ব শেষ।

এর পরে তিনি নিজে কয়েকটি আপত্তি পেশ করেছেন।

প্রথম আপত্তি: "দুটি বইতেই (পথের পাঁচালী ও অপরাজিত) প্রাকৃতিক বর্ণনার পুনরুক্তি...আছে।...বর্ণনার ভাষা ও imagery

প্রায় সর্বত্রই কতকটা একই প্রকার।...তাছাড়া, সেই দূর অজানা রহস্যময় ভবিষ্যতের কথাও বিভূতিবাবু যেখানে যেখানে তাঁর অপূর্ব মোহময় সৌন্দর্যময় ভাষায় প্রকাশ করেছেন, সেখানেও imagery ও কল্পনার বর্ণনা কতকটা এক প্রকারের। এই দুটি বইতেই প্রাকৃতিক বর্ণনা যত যায়গায় আছে তার মধ্যে বৈচিত্র্য কম...। যদিও অমরকণ্টকের বর্ণনা classical--তুলনা নেই তার।"

দ্বিতীয়ত, "...অপুর জন্যে অন্য সব চরিত্রগুলির প্রতি কতকটা অবহেলা করা হয়েছে। অনেক চরিত্রের অবতারণা বিভূতিবাবু করেছেন, কিন্তু তাদের অত্যন্ত নির্মমভাবে একে একে গল্পের মালাটি থেকে বিচ্যুত করেছেন—তারা সুন্দর সুস্পষ্ট হয়ে ফোটবার আগেই। এর জবাব দেওয়া যেতে পারে যে অপুকে প্রকাশ করবার জন্যে যতটুকু প্রয়োজন তাদের ছিল, সেটুকু শেষ হবার পর তাদের বর্জন না করে আর উপায় কি? কিন্তু আমার মনে হয়, সবগুলো গৌণ চরিত্রকে অবহেলা করাতে অপুর চরিত্রের interest কতকটা কমে যেতে বাধ্য হয়েছে। অপুর পাশে পাশে আরো দু'তিনটে চরিত্রকে বাড়তে দিয়ে তাদের সঙ্গে অপুকে জড়িত করে দিলে অপুর চরিত্রের interest আরো নিবিড় হতে পারতো। লীলা-অধ্যায়ের সম্ভাব্যতা আরও বেশী ছিল—অপুর মনোজীবনের উদ্‌ঘাটনের পক্ষেই এর দরকার ছিল।

তৃতীয় আপত্তি—'এতগুলো মৃত্যু সম্বন্ধে।...এতগুলো মৃত্যু হলো অপুর জীবনে, এটা বিভূতিভূষণের bid-out plot—একটা কৌশল। একথা মনে হয়, এদের মৃত্যু না হলে অপুর আদর্শের, idealism-এর জয় হোতো না; এক একটা জীবন যেন তার আদর্শের পথে বাধা, এক একটা মৃত্যুতে যেন সহজ হল সুগম হল। গ্রন্থকার যেন ইচ্ছে করেই এক একটি করে সমস্ত বন্ধন মুক্ত করে দিলেন, নইলে অপু অপরাজিত হতে পারে না। সর্বজয়া তাকে পিছনে টানে

অবান্তর কথাও যদি তাঁর মনে পড়ে, তবে সেটাও লিপিবদ্ধ করতে তিনি নির্দ্বিধ। একটা উদাহরণ দিই। 'মুক্তি' (গল্প পঞ্চাশৎ) গল্পে হরি যুগী মনোহারী জিনিষের ব্যবসা করে—রেশমী চুড়ি, 'কার' ইত্যাদি বিক্রি করে। এইটুকু বলেই বিভূতিভূষণের "প্রসঙ্গক্রমে মনে হল 'কার' মানে ফিতে বটে, কিন্তু 'কার' কি ভাষা? ইংরিজিতে এমন কোন শব্দ নেই, হিন্দি বা উর্দুতে নেই, অথচ কার কথাটা ইংরিজি শব্দ বলে আমরা সকলেই ধরে নিয়ে থাকি।"

লেখকের এই ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসা কিন্তু গল্পের পক্ষে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। এবং এরকম অপ্রাসঙ্গিকতার উদাহরণ বিভূতি-সাহিত্যে বিরল নয়।

বিভূতিভূষণের গল্পের কাহিনী-অংশ অত্যন্ত সরল। কোন খাঁজবাঁক নেই তার। যুগের জটিলতার কোন ছাপ নেই সেখানে। ঘটনা-বিন্যাসের কৌশলও অতি-সাধারণ, সরলমার্গী। বলার ধরণ শিথিল। ছোট গল্পে যেহেতু জীবনপথের একটি বিন্দুকে হঠাৎ চমকে তোলা হয়, সেইজন্যে সেখানে আলোকসম্পাতের কারিকুরি স্বাভাবিক, জীবনের বৃহৎ পটভূমিকায় যে সব বিষয় হয়তো খুব বড় করে নজরে পড়ে না, তারই কোন একটিকে লেখক "ক্লোজ-আপ" করে দেখান ছোটগল্পে; লেখক সেইজন্য পাঠকের চোখকে উপযুক্ত দৃষ্টিকোণের একটি ফ্রেমে সীমাবদ্ধ করবার চেষ্টা করেন; সুতরাং যে দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির তাৎপর্য সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, সেটিকে বেছে নিয়ে পাঠকের দু'চোখের ছড়ানো দৃষ্টিশক্তিকে সংহত ও তীক্ষ্ণ করে কেন্দ্রের উপর এনে ফেলা হয়। এ প্রক্রিয়া সুষ্ঠু কলাকৌশল ভিন্ন সার্থক হয় না। যেমনভাবে ঘটনাটা পরপর ঘটে, ঠিক সেইভাবে বাঁধা পথে ঘটনাটা বিবৃত করলে সব সময় সেই উদ্দিষ্ট বিন্দুটি পাঠকের চোখের সামনে চমকে ওঠে না। যেমন চলচ্চিত্র তোলবার সময় যে কোন যায়গা থেকে যে কোন

গতিতে ক্যামেরাটা এগিয়ে দিলেই সঠিক 'ক্লোজ-শট' হয় না, তেমনি কালপরম্পরা ঘটনাটাকে যে কোন ভাবে বললেই ছোট গল্প হয় না। কতটা বলব, কতটা বাদ দেব, অর্থাৎ কতটা ঐ ফ্রেমের চতুঃসীমার মধ্যে আনব, কতটা বাইরে রাখব, এ বিচার যেমন আবশ্যক, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ গল্পের দৃষ্টিকোণ ও ঘটনা-বিন্যাস। গল্প লেখক নিজে বলতে পারেন, এক বা একাধিক পাত্রপাত্রীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিবৃত হতে পারে, গল্পের দাবী অনুযায়ী সেটি নির্ধারিত করতে হবে। ঘটনা সাজানোর ক্ষেত্রেও হয়তো তার কাল-পারম্পর্য ক্ষুণ্ণ হতে পারে; ঐ উদ্দিষ্ট বিন্দুর দিকে লক্ষ্য রেখে হয়তো আগের ঘটনা পরে, পরের ঘটনা আগে আসতে পারে। এই সব কারণেই এ কালে ছোট গল্প বলার কলাকৌশলে নানান ধরণ এসেছে। এই রূপবৈচিত্র্যের বিশেষ কোন স্বাক্ষর বিভূতিভূষণে নেই।

আজকাল অধিকাংশ গল্পই আরম্ভ হয় প্রায় ক্লাইম্যাক্‌স্‌-এর অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তে; দরকার মত ফ্লাশব্যাক, সংলাপ বা অন্য কোন পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পূর্বকথা পরিমিতভাবে শোনানো হয়। গল্প লেখার এই নাটকীয় কৌশল ও কেন্দ্রসংহতি প্রায় সার্বজনিক। কিন্তু বিভূতিভূষণে এর উদাহরণও স্বল্প।

আরম্ভের মত সমাপ্তিও ছোট গল্পে আকস্মিক। বিভূতিভূষণে এই আকস্মিকতার ধাক্কা তেমন নেই। সমাপ্তিতে কোন চমক বা মোচড় দেওয়াও তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। ঘটনার মোচড় বা চমক দেওয়ার উদ্দেশ্য পাঠকের মনকে হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে বিষয়টার গুরুত্ব বোঝানো। বিভূতিভূষণ গুরুত্বকে ছড়িয়ে দেখেন গল্পের প্রায় সর্বাংশে, বিশেষ বিন্দুতে নয়, সেইজন্য এ ধরণের কৌশলের কথাও তাঁর মনে আসে না। যেখানে কোন গুরুত্বের দিকে শেষ মুহূর্তে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান, সেখানেও তাঁর পদ্ধতি আচমকা ধাক্কা মারা নয়, ধীর শান্ত আহ্বান।

বিভূতিভূষণের কতগুলি 'গল্পের' বৈশিষ্ট্য তাদের গল্পহীনতা। এই ধরণের লেখাগুলি গল্পসঙ্কলনে স্থান পেয়েছে, গল্প নামেই সাধারণত এর পরিচয়, কিন্তু এগুলি ঠিক গল্প নয়, বর্ণনা মাত্র। যেমন, 'দিবাবসান' (গল্প-পঞ্চাশৎ), 'প্রভাতী' (আচার্য কৃপালনী কলোনী)। এই অনুভূতি-লিপি স্বচ্ছন্দে তাঁর ডায়রীর অংশ হ'তে পারত বা 'বিচিত্র প্রবন্ধ' জাতীয় যদি তাঁর কোন গ্রন্থ থাকত তবে সেখানেও একে ঠাঁই দেওয়া চলত। * 'দিবাবসানে' তো কোন ঘটনা বা চরিত্রের আভাসমাত্রও নেই। দু'একটি লেখায় তার বিচ্ছিন্ন আভাস থাকলেও সেগুলি ছোটগল্পে দানা বেঁধে ওঠে নি। যেমন, 'ভুবন বোষ্টুমি' (গল্প-পঞ্চাশৎ), 'পার্থক্য' (গল্প-পঞ্চাশৎ) 'কুশল পাহাড়ী' ইত্যাদি। একটি লেখাকে তো লেখক নিজেই ছাপ মেরে দিয়েছেন 'গল্প নয়' বলে—যদিও সেটি গল্পপঞ্চাশৎ-এর (এবং জ্যোতিরিঙ্গন-এর) অন্তর্ভুক্ত। এটিকে গল্প-গোষ্ঠী থেকে জাতিচ্যুত করলে বিভূতিভূষণের আরো কিছু গল্প বাদ পড়বে, যার প্রতিটিতে তাঁর 'গল্প নয়' ছাপ মারা সম্ভব ছিল না। † অবশ্য লেখক এখানে 'গল্প নয়' বলতে এটিকে সত্য ঘটনাই বোঝাতে চেয়েছেন, সুতরাং এ কাহিনীর 'গল্প' হয়ে ওঠার দায় নেই। গল্প হিসেবে উঁচু শ্রেণীর মধ্যে না পড়লেও এতে লেখকের বিশেষ মানসভঙ্গির পরিচয় আছে; বিংশ শতকের কলুষের মধ্যে যেখানেই একটু আলোর রেখা দেখেছেন, সেইদিকে আগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

'একটি দিন'-ও (যাত্রাবদল) সেই গোত্রের 'গল্প', যেখানে কাহিনী-অংশ ও চরিত্রকথা প্রায় অনুপস্থিত; লেখকের বিশেষ মুড্-এর

---

* প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত 'রাজপথের কথা' আগে 'রাজপথ' নামে 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র অন্তর্ভুক্ত ছিল। (বিশী—রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, তথ্যপঞ্জী)

† 'গল্প নয়' নামে আর একটি লেখা আছে বিভূতিভূষণের, শেষ বয়সের রচনা এটি। 'কুশল পাহাড়ী' গ্রন্থে লেখাটি সঙ্কলিত। ক্ষীণ কাহিনীসূত্রে হরিনামের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে এই লেখাটিতে।

ক্ষীণ ঐক্যসূত্রকে অবলম্বন করে লেখাটি দাঁড়িয়ে আছে, এবং ঐ মুড-সর্বস্বতার জন্যেই এ লেখা অনেকটা গীতিধর্মী।

এই গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য যেমন ঘটনাহীনতা, তেমনি ঠিক বিপরীত ধরণের বিচ্যুতিও তাঁর গল্প-সাহিত্যে কম নয়। এই সব গল্প ঘটনার বাহুল্য দ্বারাই স্বধর্মচ্যুত। যেমন, 'ডানপিটে' (যাত্রাবদল), 'একটি কোঠাবাড়ির ইতিহাস' (গল্প-পঞ্চাশৎ) প্রভৃতিতে দীর্ঘ কাহিনী—দু'তিন পুরুষ ধরে তার বিস্তার, ছোট-গল্পের নিবিড় সংহতি এখানে ক্ষুন্ন। ভাব-ঐক্যের অভাব এগুলিকে গল্পের মর্যাদা দেয় নি, আবার যে সময় ও মনোযোগ দিলে এগুলি উপন্যাস হতে পারত তাও অনুপস্থিত। মাঝামাঝি ধরণের, দোআঁসলা সৃষ্টি এগুলি। বিষয়-বিচারে এগুলি উপন্যাসের সগোত্র, লিখনভঙ্গি ছোটগল্পের অভিমুখী।

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য তাঁর উপন্যাসের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী। উপন্যাসে তিনি যে জগতে সীমাবদ্ধ তার বাইরে পদচারণার স্বাক্ষর তাঁর ছোট গল্পে বর্তমান। এর কারণ, কোন বিশেষ বিষয়ের স্বল্প-অভিজ্ঞতাতেও ছোট গল্প সম্ভব, উপন্যাসের দাবী বিশদ অভিজ্ঞতা। তাঁর উপন্যাসে সেই অভিজ্ঞতার সাক্ষাৎ পাই, যার মধ্যে তিনি দীর্ঘকাল-নিমজ্জিত; আর গল্পে এর ছাপ তো আছেই, উপরন্তু নানা টুকরো অভিজ্ঞতার স্বাদ-বৈচিত্র্যও মাঝে মাঝে উপস্থিত।

বিভূতিভূষণের বহু ছোট গল্পে কাহিনী বলা হয়েছে 'আমি'-র মারফৎ। অধিকাংশ গল্পই যেন লেখকের জীবনে ঘটেছে, অথবা তিনি শুনেছেন, এমনি ভঙ্গিতে বলা। এর ফলে গল্পগুলিতে বেশ একটা অন্তরঙ্গতার স্পর্শ আছে, এবং সুরটা এত ব্যক্তিগত যে বহু সময় ভুলে যেতে হয় যে গল্প পড়ছি। মনে হয় যেন লেখকের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শুনছি। এটা একদিকে যেমন গুণের কথা, অন্যদিকে অতি-ব্যবহারে এর অসুবিধাও ঘটেছে। প্রথমতঃ, একই ভঙ্গির সব গল্প পড়তে শেষ পর্যন্ত একঘেয়ে লাগে; দ্বিতীয়ত, বহু

স্থানে গল্পের স্বাদের বদলে ডায়রীর স্বাদ পেতে হয়—গল্প পড়তে বসে অনেক পাঠক এটাকে লোকসান মনে করবে।

বিভূতিভূষণের গল্প-সাহিত্যটি অতিকায়। গল্পের সংখ্যা অনেক, কিন্তু সর্বত্র সেই অনুপাতে প্রতিটি রচনার মান রক্ষিত হয় নি। নিছক রসোত্তীর্ণ গল্পের কথা নয়—তার সংখ্যা যথেষ্টই আছে, নইলে এ আলোচনার প্রয়োজনই থাকত না। কিন্তু সমালোচকরা যখন বাংলা গল্পসাহিত্যকে বিশ্ব-দরবারের সমস্তরভুক্ত বলে মনে করতে সুরু করেছেন, তখন সেই স্তরের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে এমন গল্পের কথাও ভাবতে হবে আমাদের।

॥ দুই ॥

॥ মানসধারা ॥

যে সব লেখকের গল্পের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী, সেখানে আলোচনার সুবিধের জন্য শ্রেণীবিভাগের রীতি প্রচলিত। এ শ্রেণীবিভাগ নানা ধরণে হতে পারে, কিন্তু কোন সমালোচকই বোধ হয় এ দাবী করতে পারেন না যে তাঁর অনুসৃত পন্থাই রস-উপলব্ধির চরম পন্থা। বরং উলটো কথাটাই বোধ হয় বেশী সত্যি; যত ভাল করেই ছক কাটা যাক না কেন, সেই ছকের ছাঁকুনিতে রস তোলা দুস্কর। কারণ, সাহিত্য-রস বস্তুটাই যান্ত্রিক ছকের বিরোধী, এবং কোন লেখকই অনুরূপ যান্ত্রিক প্যাটার্নে গল্পগুলি সৃষ্টি করেন না।

আসলে শ্রেণীবিভাগটা সমালোচকের নিজের সুবিধের জন্যে, যে জন্যে একই লেখকের গল্পের নানা ধরণের শ্রেণীবিভাগ হয়ে থাকে বিভিন্ন সমালোচকের হাতে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিভাগ। সে ক্ষেত্রটি নানা মুনি নানা রীতিতে ভাগ করেছেন।

এই সব বিড়ম্বনার কথা জানা থাকা সত্ত্বেও অসংখ্য গল্পের সামনে দাঁড়িয়ে সমালোচক যখন বিভ্রান্ত ও বিমূঢ় হয়ে পড়েন, তখন কয়েকটা ভাগ করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এতে তবু গল্পগুলিকে যেন হাতের মুঠোয় ধরা যায়।

এখানেও কয়েকটা মুঠোয় আমরা গল্পগুলোকে তুলে ধরে দেখতে চাই, এবং সে-দেখার মূল উদ্দেশ্যটা থাকবে বিভূতিভূষণের মনোলোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয়-সাধন। ইতিপূর্বেই তাঁর যে সব বিভিন্ন মানসপ্রবণতা আমরা লক্ষ্য করেছি, প্রধানত তারই নিরিখে গল্পগুলিকে একটু সাজিয়ে নিতে চাই। তাতে লেখকের মানসলোক আরো একটু বেশী পরিস্ফুট হবার সম্ভাবনা। এর সাহায্যে কতগুলি

মানসপ্রবণতাকে যেমন আরো উজ্জ্বল আকৃতিতে দেখা যাবে ; তেমনি উপন্যাসে-অনুপস্থিত কতগুলি নূতন সম্ভাবনারও ইঙ্গিত পাওয়া যাবে, যে-সম্ভাবনা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণ-পরিণত নয়, ব্যতিক্রম হিসেবেই মাত্র উল্লেখ্য।

লেখক হিসেবে বিভূতিভূষণের একটা বড় পরিচয় তাঁর প্রকৃতি-প্রীতিতে। কিন্তু 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'আরণ্যক' প্রভৃতি তাঁর প্রধান উপন্যাসগুলিতে এই প্রকৃতিমুখিতা যত প্রবল, গল্পগুলিতে তত নয় ; বরং বলা যায়, ছোটগল্পে বিভূতিভূষণের প্রধান লক্ষ্য—মানুষ। প্রকৃতি সেখানে কিঞ্চিৎ পরোক্ষ। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছে'র মত 'জীবনের বর্ণনা প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্ন আবেষ্টনের মধ্যে দ্বীপের মতো জেগে-জেগে' * ওঠে নি বিভূতিভূষণের গল্পে। বরং ঐ 'জীবনের বর্ণনা'-কেই যেন লেখক লক্ষ্য বলে ভেবে নিয়েছেন তাঁর গল্পগুলিতে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রকৃতিবর্ণনা অবশ্যই আছে, কিন্তু তা খুব বেশী নয়। বা আরো কোন গভীর অর্থে প্রকৃতি গল্পগুলির অংশীদার নয়। মানুষ, বিশেষত গ্রামীণ মানুষ, এখানে পনেরো-আনার সরিক। তবে লেখক তো শেষ পর্যন্ত বিভূতিভূষণই, তাই 'কনে দেখা'-র (যাত্রাবদল) মত গল্পও তাঁর কাছে পাওয়া গেছে, যেখানে নায়ক হিমাংশু তার প্রিয় এরিকা পাম্ গাছটিকে মনুষ্য-সমতুল্যই ভাবে, এবং ভালবাসে। এরিকা পাম্-টি যখন অন্যের বাড়ীতে দুরবস্থা-গ্রস্ত, তখন হিমাংশু ওকে একদিন দেখতে গেল। সেখানে হিমাংশুর মনে হোলো, 'গাছটা যেন আমায় চিনতে পারলে।' তার আরও মনে হোলো, 'ও যেন বল্‌ছে, আমায় এখান থেকে নিয়ে যাও, আমি তোমার কাছে গেলে হয় তো এখনও বাঁচবো। ছেড়ে যেও না এবার। আমায় বাঁচাও।'

* বুদ্ধদেব বসু, রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য, পৃঃ ৪৪।

রাত্রে হিমাংশুর ভাল ঘুম হোলো না, পরদিন এরিকা পাম্‌কে সে উদ্ধার করল এবং একে সংসারী করবার সাধ তার। হিমাংশু এরিকা পাম্‌-এর বিয়ে দেবে। 'তাই একটা ছোট-খাট অল্প বয়সের, দেখতে-ভাল পাম্ খুঁজছিলাম।' গল্পে হিমাংশুর শেষ উক্তিঃ 'হি-হি পাগল নয় হে, পাগল নয়, ভালবাসার জিনিষ হোত তো বুঝতে।' এ ভালবাসা বিভূতিভূষণের মত মানুষের পক্ষে বোঝা অপেক্ষাকৃত সহজ সন্দেহ নেই।

'জাল' (কুশল পাহাড়ী) সূক্ষ্মভাবে 'আরণ্যক'-এর কথা মনে করিয়ে দেবে। রামলাল ব্রাহ্মণ দণ্ডক বনে এসেছে, এর অংশবিশেষ নির্মূল করে ভরহেচনগরের প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু রামলাল ভালবেসে ফেলেছে দণ্ডকবনকে। তুলসীদাসের এই দুটী লাইন তার প্রিয়ঃ

শোভিত দণ্ডক বন কি রুচী বনী
ডাঁতিন ডাঁতিন সুন্দর ঘনী—

'হু-হু বাতাস বইচে, সপ্তপর্ণ-পুষ্পের উগ্র সুবাস ভেসে আসচে বনের দিক থেকে, হৈমন্তী-জ্যোৎস্না-স্নাত এই বনান্তস্থলী স্বপ্নপুরীর মত মায়া বিস্তার করেচে ওই বৃদ্ধ রামলালের মনে, অনসূয়া বাঈয়ের মনে, সাবিত্রীর মনে…'

তাই ভরহেচনগর বাস্তবে রূপায়িত হয় না। দিন কাটে, কর্মহীনতা যখন বিবেক দংশন করে, তখন একটু নড়ে-চড়ে ওঠে রামলাল। এই রামলাল ব্রাহ্মণ 'আরণ্যক'-এর নায়ক তথা লেখকের সগোত্র। যুগের স্রোত তাদের টেনে নিয়ে চলেছে প্রকৃতি-ব্যাভিচারী সভ্যতার দিকে, আর হৃদয় এদের প্রকৃতি-সৌন্দর্যের স্নিগ্ধ জীবনের জন্য তৃষ্ণার্ত।

এই রামলাল অনসূয়া সাবিত্রী, এরা মানুষ কেমন? না, 'ওদের মন কি সুন্দর! কত যায়গায় গেলাম, এদের মত মন কোথাও পেলাম না।'

এই মনকে পাওয়ার আগ্রহ যতটা তীব্র, বাস্তবের প্রতিস্পর্ধী স্রোতের তীব্রতা তার চেয়ে কম নয়, বরং বেশী। তাই 'অভিমানী'

(কুশল পাহাড়ী) গল্পের নায়ক গ্রামীণ সরল পবিত্র রাখনিকে বিয়ে করতে পারে না, অথচ তাকে ছেড়ে যেতেও তার দুঃখ কম নয়। ঠিক এই বেদনা 'উন্নতি'-র (কিন্নরদল) নায়ক গোকুলেরও আছে। গ্রামীণ মেয়ে বাল্যের সঙ্গী বীণার প্রতি তার প্রীতি কম নয়, আবার সে 'চায় যা নাগালের বাইরে তাকে হাতে আঁকড়ে ধরতে, চায় তার রূপ, চায় উন্নতি, ছোট চায় বড়কে আয়ত্ত করার আত্মপ্রসাদ…' 'খোসগল্প'-র (কিন্নরদল) বিষয়বস্তুও প্রায় এই।

'তেলিনীপোতা আবিষ্কার' (প্রেমেন্দ্র মিত্র) এবং 'যাদুঘর'-এর (সন্তোষ ঘোষ) নায়কেরও ইচ্ছা নায়িকার কাছে থাকবার, জীবনস্রোত তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ঐ কোমল দ্বীপখণ্ডের কাছ থেকে। কিন্তু এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বিভূতিভূষণের চেয়ে আলাদা। রূঢ় বাস্তববুদ্ধির আলোকে এ গল্প দুটির স্বাদ ভিন্ন, বিভূতিভূষণের গল্প স্নিগ্ধ, বেদনার্ত। প্রেমেন্দ্র-সন্তোষের নায়িকারা নায়কদের চূড়ান্ত ভাষণের সময়েও জানে তার বন্ধ্যাত্ব। তাদের বহু-পোড়-খাওয়া মন আশা করবার মত পুঁজিটুকুও হারিয়ে ফেলেছে। আর বিভূতিভূষণের নায়িকারা নিঃসঙ্গ দ্বীপখণ্ডের মত আকাশের দিকে চেয়ে আকাশ-কুসুম বোনে এবং ব্যর্থ প্রত্যাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে।*

পূর্বোক্ত 'জাল' গল্পের একটি উক্তি, 'মেয়েরা হচ্ছে আসলে মা, তার পরে অন্য কিছু।' প্রায় একই কথা 'অপরাজিত' গ্রন্থেও আছে। এই মাতৃরূপা স্নেহময়ী নারী বিভূতিভূষণের প্রিয়। উপন্যাসের মত গল্পেও এ রকম বহু নারীচরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

এই মা-র চমৎকার উদাহরণ 'আহ্বান'-এর (শ্রেষ্ঠ গল্প) বুড়ী। সকল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে যে মাতৃ-স্নেহ অকম্পিত দীপ্তিতে

* প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সন্তোষ ঘোষের গল্পের মূল ভাবটির সঙ্গে জন্ গলসওয়ার্দি-র 'দি অ্যাপ্‌ল্‌-ট্রি'-র সাদৃশ্য আছে। অবশ্য প্রকাশকলায় সকলেই স্বতন্ত্র।

উজ্জ্বল তার প্রতীক যেন ঐ বুড়ী। এক মুসলমান বুড়ীর অতিরক্ত গায়ে-পড়া স্নেহ লেখককে প্রথমে প্রসন্ন করতে পারে নি, বরং বিরক্ত ও বিব্রত করেছে। বুড়ীর মৃত্যুদিনে লেখক ঐ মাতৃহৃদয়কে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছেন। আজ তিনি বিরক্ত নন। 'আমার মনে পড়লো বুড়ী বলেছিল সেই একদিন—আমি মরে গেলে তুই কাফনের কাপড় কিনে দিস্ বাবা। ওর স্নেহাতুর আ্যা বহুদূর বারাণসী থেকে আমায় কিভাবে আহ্বান করে এনেচে।...দিলাম এক কোদাল মাটি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হোল, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠতো—অ মোর গোপাল।'

আপাতদৃষ্টিতে বা সমাজদৃষ্টিতে যারা নীচ, হীন ও পতিত, তাদেরও স্নিগ্ধ উজ্জ্বল নারীরূপটি আবিষ্কার করতে তিনি অভ্যস্ত। বুধোর মা (বুধোর মায়ের গল্প—গল্প-পঞ্চাশৎ), কুসুম (হিঙের কচুরি—গল্পপঞ্চাশৎ), সুলোচনা (সুলোচনার কাহিনী * গল্পপঞ্চাশৎ), গিরিবালা (আচার্য কৃপালনী কলোনী)—এরা সবাই সমাজে হীন, কেউ কেউ বা গণিকা, কিন্তু সস্নেহ এক পবিত্র ব্যক্তিত্বকে তিনি এদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। (তাঁর উপন্যাসেও এ জাতীয় চরিত্রের অভাব নেই। গ্রন্থের অন্যত্র এ বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য)। এই ধরণের চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বোধ হয় হাজু (বিপদ—শ্রেষ্ঠ গল্প)। সারল্য যার চরিত্রের সম্পদ, মালিন্য তাকে স্পর্শ করতে পারে না। ধূলোর মধ্যে বসে থাকলেও শিশু মলিন হয় না। বহতা নদী নির্মলা—সেটা গতির গুণ। গতির মত সারল্যের ঐ রকম একটা গুণ আছে, যাতে নদী সমলা হয় না। সত্যিকার সারল্যও একটা শক্তি, সে পাপের মাঝে থাকলেও পাপকে স্পর্শ করতে দেয় না। এই সারল্যের পবিত্রতার জন্যই পতিতা হাজু লেখকের সমর্থন আদায় করে নিয়েছে। আর দারিদ্র্য যাকে রেখেছিল

* বিভূতিভূষণ 'অপরাজিত'-এর প্রণব ছাড়া রাজনৈতিক কর্মীর চরিত্র বিশেষ আঁকেন নি। ওদিকটায় তাঁর প্রবণতা ছিল না। 'সুলোচনার কাহিনী'তে নায়ক একজন রাজনৈতিক কর্মী। সেই দিক থেকেও এই গল্পটি উল্লেখযোগ্য।

পূর্ণ-বন্ধ্যা করে, তার একটা সাফল্যের ইঙ্গিত তো এর মধ্যে উচ্চারিত। সুতরাং লেখক নিন্দা করতে গিয়েও থেমে গিয়েছেন। অন্য যে কোন লেখকের হাতে পড়লে এই গল্পটি বিদ্রোহে অথবা ব্যঙ্গে প্রবল একটা রূপ নিত। কিন্তু বিভূতিভূষণের সবিস্ময় প্রশান্তি দেখে থমকে যেতে হয়। এই 'পাপ'-এর অনাড়ম্বর সমর্থন এত অনুত্তেজিতভাবে তিনি করলেন কি করে! ইচ্ছে ছিল তিরস্কার করবেন হাজুকে, কিন্তু 'ও উৎসাহ পাইয়া আমাকে ঘরের এ জিনিষ ও জিনিষ দেখাইতে আরম্ভ করিল! একখানা আয়না, একটা টুকনি ঘটি, একটা সুদৃশ্য কৌটা ইত্যাদি! এটা কেমন? ওটা কেমন? সে এসব কিনিয়াছে। তাহার খুসি ও আনন্দ দেখিয়া অতি তুচ্ছ জিনিষেরও প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না। এতক্ষণ ভাবিতেছিলাম, ইহাকে এ পথে আসিবার জন্য তিরস্কার করি এবং কিছু সদুপদেশ দিয়া জ্যাঠামশায়ের কর্তব্য সমাপ্ত করি। কিন্তু হাজুর খুশি দেখিয়া ওসব মুখে আসিল না।'

এই সঙ্গে হাজু সম্পর্কে আরো একটা চিন্তা লেখকের মনে উদয় হয়েছে, 'যে কখনো ভোগ করে নাই, তাহাকে ত্যাগ করো যে বলে, সে পরমহিতৈষী সাধু হইতে পারে; কিন্তু সে জ্ঞানী নয়। কাল ও ছিল ভিখারিণী আজ এ পথে আসিয়া ওর অন্নবস্ত্রের সমস্যা ঘুচিয়াছে, কাল যে পরের বাড়ি চাহিতে গিয়া প্রহার খাইয়াছিল, আজ সে নিজের ঘরে বসিয়া গ্রামের লোককে চা খাওয়াইতেছে, নিজের পয়সায় কেনা পেয়ালা পিরিচে—যার বাবাও কোনদিন শহরে বাস করে নাই বা পেয়ালায় চা পান করে নাই। ওর জীবনের এই পরম সাফল্য ওর চোখে। তাহাকে তুচ্ছ করিয়া ছোট করিয়া নিন্দা করিবার ভাষা আমার জোগাইল না।'

বিভূতিভূষণে নারীর মন দূরাভিসারী নয়। গৃহপ্রীতি তাদের মর্মমূলে। সংসারে-উপেক্ষিতা ব্যাধি-ক্লিষ্টা দ্রবময়ী (দ্রবময়ীর কাশীবাস

—শ্রেষ্ঠ গল্প) তাই সত্তর বছর বয়সেও তীর্থে তৃপ্তি পায় না। 'কাশী পেরাপ্তিতে দরকার নেই—এই ভিটেই আমার গয়া কাশী।' বাড়ীতে ফিরে দ্রবময়ী দেখলেন, 'বেলা যায় যায়—আষাঢ়ান্ত সুদীর্ঘ দিনমানের শেষে সূর্য ঢলে পড়েচে পশ্চিম দিকের নিবিড় বাঁশবনের আড়ালে। ঘেঁটকোল ফুল কোথাও জঙ্গলে ফুটেচে, বাতাসে তার কটু উগ্র গন্ধ। দ্রব ঠাকরুণের মন শান্তিতে, আনন্দে উৎসাহে পূর্ণ হয়ে গেল।'

দূরাভিসারী মন বিভূতিভূষণের পুরুষদের। তাঁর দরিদ্র ছাপোষা মানুষও দূরের স্বপ্ন দেখে। শম্ভু ডাক্তার ও গোপীকৃষ্ণ (একটি ভ্রমণকাহিনী—শ্রেষ্ঠ গল্প) কত যায়গায় ভ্রমণের পরিকল্পনাই না করে। কিন্তু দারিদ্র্য ও গার্হস্থ্য ঝামেলা তাদের পায়ে চির-শৃঙ্খল পরিয়েছে। তারা শেষে একদিন যায় লাঙ্গলপোতা—বারাসাত থেকে দু মাইল দূর। ব্যঙ্গ করেননি লেখক এদের। কারণ এরা ঠকে নি। লাঙ্গলপোতা তো খারাপ যায়গা নয়। 'সত্যি বেশ যায়গা। অনেক কিছু দেখবার আছে। একটা পুরোনো শিবমন্দির। চৌধুরীদের বড় মজা দীঘি,...মেটে রাস্তা। ...হাট বসে—বেগুন-কুমড়ো-ঝিঙে-রাঙাআলু বিক্রী হয়। রামায়ণ গান হোল নবমীর রাত্রে। পরদিন হোল গ্রামের দলের কেষ্ট যাত্রা।'

দূরের একটু আভাস তো অন্তত তারা পেয়েছে। গ্রাম-প্রকৃতির একটু স্পর্শ লেগেছে তাদের গায়ে। তাই 'মালিপোতা গ্রামের মধ্যে বিখ্যাত ভ্রমণকারী' সিঁদুরচরণ, যে কেষ্টনগরের দু' ইষ্টিশান ওদিকে গিয়েছিল তাকে ঠাট্টা করেন নি লেখক। 'পথের দেবতা'-র প্রসাদ-কণিকা পেয়েছে সে। সুতরাং লেখকের সতীর্থ।

সৎ সরল মনের দিকে বিভূতিভূষণের ঝোঁক। সততা ও সারল্য যেখানেই পেয়েছেন, সঞ্চয় করেছেন। তাঁর বহু গল্প 'এই সংগ্রহের আধার। আদিবাসীদের তিনি ভালবাসতেন তারা এই

মনের অধিকারী ব'লে। এদের নিয়ে তাঁর অনেকগুলি গল্প আছে। বাংলা-সাহিত্যে আদিবাসীদের এতখানি গুরুত্ব আর কোন লেখক দেন নি। 'কুশল পাহাড়ী' গ্রন্থের 'শিকারী' ও 'চাউল', গল্প-পঞ্চাশতের 'কয়লা-ভাঁটা' আদিবাসীদের সরল জীবনযাত্রার গল্প। 'বনে পাহাড়ে' এবং 'হে অরণ্য কথা কও' ডায়রী দুটীতেও লেখকের আদিবাসীপ্রীতির পরিচয় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। আর 'আরণ্যকে' এ পরিচয় সংহত মহিমা পেয়েছে।

বিলাতী সাহেবের প্রতি আমাদের মন রাজনৈতিক কারণে অপ্রসন্ন। তাদের অত্যাচারী মূর্তি দেখতেই আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু বিভূতিভূষণের 'থনটন কাকা' (গল্প-পঞ্চাশৎ) বা 'নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব' * (আচার্য কৃপালনী কলোনী) তেমন লোক নন। ফালমন সাহেব তো বলতেন, 'এদেশেই জন্ম, এ দেশ ভালবাসি'। তাদের সরল আন্তরিকতার গুণেই তারা বিভূতিভূষণের এত প্রিয় হয়েছে।

বিভূতিভূষণ তাঁর ছোট গল্পে এমন অনেকগুলি মানুষ পাঠককে উপহার দিয়েছেন, যারা প্রলোভন সত্ত্বেও অর্থলোভের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে তাদের সততাকে রক্ষা করেছে। 'দৈবাৎ' (গল্প-পঞ্চাশৎ), 'পড়ে পাওয়া' (আচার্য কৃপালনী কলোনী), 'হাজারি খুঁড়ির টাকা' (আচার্য কৃপালনী কলোনী) প্রভৃতি গল্প খুব উচ্চাঙ্গের না হলেও লেখকের বিশেষ প্রবণতা-সূচক। বিশেষ ক'রে তাঁর শেষ জীবনে, যখন বিংশ শতাব্দীর আকাশ খুবই কালো, তখন তিনি সৎ ও সরল মানুষগুলিকে দীপবর্তিকার মত তুলে ধরতে চেয়েছেন। 'ভিড়' (গল্প-পঞ্চাশৎ), 'গল্প

* গল্পটি সামান্য বাস্তব ভিত্তি আছে। 'সাহেবদের নীলকুঠির ধ্বংসস্তুপের ওপর প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় বেড়িয়ে বেড়ালুম—কোথায় আজ সেই লালমুরা ফালমান সাহেবের দল…' 'হে অরণ্য কথা কও, পৃঃ ১৩৯।

ফালমন সাহেব ও তাঁর নীচজাতীয়া দাসীর সঙ্গে 'ইছামতী'-র বড় সাহেব ও গয়ামেমের সাদৃশ্য আছে।

নয়' (গল্প-পঞ্চাশৎ), 'আমার ছাত্র' (আচার্য কৃপালনী কলোনী) 'বেনিয়ম' (কুশল পাহাড়ী) প্রভৃতিতে এর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাবে। বিভূতিভূষণ এই যুগের লোভী স্বার্থপর রূপ দেখে এতদূর ক্লিষ্ট হয়েছিলেন যে গল্পের সীমা প্রায় অতিক্রম করে তাঁর উদ্দেশ্যকে অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে রেখেছিলেন এই গল্পগুলিতে। উদ্দেশ্য-জ্ঞাপক অন্তত একটা প্যারাগ্রাফ এই ধরণের প্রায় গল্পেই পাওয়া যাবে।

'গল্প নয়'-এ 'কুশ্রী কদাকার' একটি ছেলেকে নিয়ে এক বৃদ্ধ ট্রেণের কামরায় উঠল। বলা বাহুল্য, ছেলেটি গাড়ীর লোকজনের কাছ থেকে বিশেষ মধুর অভ্যর্থনা পেল না। ইতিমধ্যে দুটি স্ত্রীলোক এলো গাড়ীতে, যাদের 'একটি তরুণী বধূ, মলিন শাড়ী পরণে, রুক্ষ চুল, মুখশ্রী সুন্দর, চোখ দুটিতে পল্লীপ্রান্তের শান্ত অবসর', এবং 'চোখে —অদ্ভুত স্নেহঝরা দৃষ্টি।' এরা ছেলেটিকে আপন জ্ঞানে 'ঐ ছোট্ট রুগ্ন খোকার রোগ সম্বন্ধে, পথ্য সম্বন্ধে, ওর চিকিৎসা সম্বন্ধে' কত কথা জিজ্ঞেস করল মার মত দরদ-ভরা গলায়। এই ঘটনা দেখতে দেখতে 'আমি বিস্মিত হয়ে উঠেছি। এমন একটা ঘটনা যেন দেখছি যা শুধু এই বিংশ শতাব্দীর নয়, সর্বকালের, সর্বযুগের। মানুষের প্রতি মানুষের হিংসায়, শঠতায়, নিষ্ঠুরতায়, স্বার্থপরতায়, ঈর্ষায় যে বিংশ শতাব্দীর নভোমণ্ডল আজ ধূম-মলিন—যে বিংশ শতাব্দীতে আছে শুধু অর্থের আদর—সেখানে এই ময়লা-শাড়ি-পরণে দরিদ্রা পল্লীবধূটি ও তার করুণাময়ী সঙ্গিনী এক নতুন বার্তা শুনিয়ে দিলে। সে বার্তা নতুন হলেও হিমালয়ের মতই পুরনো।

'এই গাড়ির মধ্যে এত পুরুষমানুষ ছিল, কেউ ফিরেও চেয়ে দেখে নি ছেলেটার দিকে। সনাতনী মাতৃরূপা নারী দুটি এসে এই মাতৃহীন মৃত্যু-পথযাত্রী শিশুকে মাতৃস্নেহের বহু-পুরাতন অথচ চির-নূতন বাণী শুনিয়ে দিলে। সেদিন সে ট্রেণের মধ্যে গুটি-কয়েক ক্ষণের জন্য বিংশ-শতাব্দী ছিল না—সমাজদ্রোহী, কালোবাজার-পুষ্ট

লোভী বিংশ-শতাব্দী। ছিল সেই অমর মাতৃলোক, বিশ্বের সমগ্র জীবজগৎ যার করুণাধারায় বিধৌত।'

'ভিড়'ও * প্রায় ঐ রকম অংশ আছে। ট্রেণের ভীড়ে যখন 'মন নিষ্ঠুর নির্মম হয়ে উঠেছে···। অন্য কারও সুবিধা-অসুবিধা সে এখন বুঝতে রাজী নয়,' তখন পুত্রশোকাতুর লোকটা 'হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।' সঙ্গে সঙ্গেই 'গাড়ীর আবহাওয়া ওর কান্নার সুরে কি আশ্চর্যভাবেই বদলে গিয়েছে। এই নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা, উগ্র স্বার্থবোধ, যা হাওড়া থেকে উঠে পর্যন্ত সমানে দেখে আসছি, যাতে শুধু মানুষের পশুত্বের ছবিটাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল চোখের সামনে, ওই লুঙ্গি-পরা লোকটির চোখের জলে সব যেন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। মানুষের লজ্জা হল মানবতার অপমানে যেন। যেন সবাই সতর্ক হয়ে উঠল।'

'আমার ছাত্র' গল্পটি আরম্ভ হচ্ছে এই ভূমিকা করেঃ 'মানুষের প্রতি মানুষের এই যে হিংসা, এই যে উলঙ্গ বর্বরতা আচরিত হচ্ছে সভ্যতার নামে, শতবৎসরের শিক্ষা সংযম এক মুহূর্তে যাতে করে তৃণের মত উড়ে গেল, উদগ্র লোভ, হিংসা ও লালসার এই যে নগ্ন মূর্ত্তি দেখা গেল চোখে—তাতে দমে গেলে চলবে না। মানুষ আছে এখনও, মানবতা আছে, মনুষ্য সমাজ থেকে লজ্জায় মুখ ঢেকে বিদায় নেবার সময় ভগবান এদেরই দিকে ফিরে ক্ষীণ আশ্বাসের বাণী শুনতে পান, শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ান।'

গণেশদাদার কথা এতদিন বলবার যোগ্য বলেই ভাবেন নি, কিন্তু আজ তার ছবি লেখকের মনের পটে মস্ত বড় হয়ে ফুটে উঠেছে। তার একটা কারণ 'গণেশদাদা আমার ছাত্র', আর দ্বিতীয় কারণ, 'কি বৈষয়িক উন্নতির দিক থেকে কি ইংরিজি শিক্ষার দিক থেকে

* 'ভিড়'ও 'গল্প নয়' দুটো প্রায় একই ঘটনা। এদের সঙ্গে একটি বিদেশী গল্পের দূর-সাদৃশ্য আছে।

গণেশদাদা সারা জীবন প্রথম সোপানের দিকেই রয়ে গেল বটে কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওর মধ্যে এমন কিছু ছিল, যার সাহায্যে ও সব সোপান অতিক্রম করে, আমাদের অনেককে অতিক্রম করে, অনেক উঁচুতে গিয়ে পৌঁছেছিল। তাই আজকের দিনে বার বার তার কথা মনে পড়ে।' *

গণেশদাদা সম্পর্কে লেখক এক যায়গায় বলেছেন, 'মনুষ্য সমাজ থেকে লজ্জায় মুখ ঢেকে বিদায় নেবার সময় ভগবান এদেরই দিকে ফিরে ক্ষীণ আশ্বাসের বাণী শুনতে পান, শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ান।'

লেখক যেন বলতে চান ঈশ্বরের বিশেষ করুণা আছে এই সৎ নির্লোভ সরল মানুষগুলোর ওপর, উভয়ের সান্নিধ্য ঘনিষ্ঠ ঐ সারল্যের গুণে, লেখক এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে এমন কয়েকটি চরিত্র এঁকেছেন যারা সারল্যকে পাথেয় করে একটা আধ্যাত্মিক স্তরে উঠে এসেছে। কুশল পাহাড়ী (কুশল পাহাড়ী) 'মড়িঘাটের মেলা'-র বুনো সাধু (আচার্য কৃপালনী কলোনী), গিরিবালা (আচার্য কৃপালনী কলোনী) এরা এই ধরণের চরিত্র।

'দুর্মতি' (গল্প-পঞ্চাশৎ) ও 'সঞ্চয়'-এর (গল্প-পঞ্চাশৎ) নায়করা সততা থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। লেখক তাদের অনুতাপের অনলে শুদ্ধ করে নিয়েছেন। গল্প দু'টি আসলে এক। উভয় ক্ষেত্রেই অসততার কারণ দারিদ্র্যের চাপ, বঞ্চনার পাত্র দু'যায়গাতেই স্ত্রী।

---

* 'আমার ছাত্র'-র সঙ্গে বনফুলের 'অর্জুন কাকা'র বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য আছে। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য উভয়ে দুস্তর। বিভূতিভূষণ গণেশ মুচিকে অনেক 'উঁচুতে' দেখছেন আর বনফুল সুদীর্ঘ কাহিনীতে বয়স্ক অর্জুন জেলের শিক্ষা সাধনার বিবরণ দিয়ে যখন আমাদের মনে তার একটা আসন প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন, তখন সিন্দুক-উপাখ্যানে তার নির্বুদ্ধিতা দেখিয়ে একটা তুড়িতে সে আসন ভেঙে দিলেন। যেন বনফুল বলতে চান, হাজার লেখাপড়া শিখলেও অর্জুন জেলে অর্জুন জেলেই।

বিংশ শতকের লোভ ও কলুষের বিরুদ্ধে বিপরীত চরিত্র হিসেবে যেন লেখক সরল নির্লোভ মানুষগুলিকে এঁকেছেন। কিন্তু এরা সকলেই নিস্ক্রিয় ধরণের চরিত্র। এই কলুষের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল সক্রিয় রাজনৈতিক বা সামাজিক কর্মী তাঁর সাহিত্যে নেই। প্রণব (অপরাজিত) বা 'সুলোচনার কাহিনী'-র নায়কেরও রাজনৈতিক চিন্তা বা কর্মের কোন পরিচয় দেওয়া হয় নি।

সরকারী উদ্যোগে কোন সাহিত্য-সভা বা গ্রন্থসঙ্কলনের আয়োজন হলে তাতে রাজনৈতিক বিষয় আনয়নে তথা সরকারের গুণগান বর্ণনায় বহু সাহিত্যিক অনুপ্রাণিত হন। শ্রীজহরলাল নেহরুর ষষ্টিতম বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে তাঁকে প্রদত্ত 'নেহরু অভিনন্দন গ্রন্থে' বিভূতিভূষণের 'The Consolation' * নামে যে গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে অনুরূপ অনুপ্রেরণা তিনি পান নি। গল্পটি পুরোপুরি তাঁর নিজের মনের সুরে বাঁধা। শুধু একটা যায়গায় মুহূর্তের চিত্তবিক্ষেপ বোধহয় তাঁর ঘটেছিল। অপ্রাসঙ্গিকভাবে সেখানে তিনি 'রামধুন' গেয়েছেন :

'আজ মনে হচ্ছে অকূল সমুদ্রে সে কূলের আভাস দেখতে পাচ্ছে। সকলেই বলছে যে দেশ যখন স্বাধীন হয়েছে তখন এবার সব দুঃখকষ্ট ঘুচল, ছেলেরা ভাল ভাল কাজ পাবে আর তাড়াতাড়ি উন্নতি হবে—সামান্য কটা টাকার জন্যে আর জীবনপাত করতে হবে না। স্বাধীন পৃথিবীতে আর কেউ ক্ষুধার্ত থাকবে না—অনেক বড় বড় কাজ হবে—চারিদিকেই সভা-সমিতি ও বক্তৃতার ধূম পড়ে গেছে। কয়েক দিন আগেও সকলে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতি ফুলের মালায় সাজিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। সেদিন তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

---

* ইংরাজী ভাষায় গল্পটি ১৯৪৯ খৃঃ প্রকাশিত হয়। গল্পটির মুল বাংলা পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে। বাংলায় অনূদিত করে এটি প্রকাশ করেন দেবীদাস চট্টোপাধ্যায়। কথাসাহিত্য, কার্তিক, ১৩৬৫ দ্রষ্টব্য। উদ্ধৃত অংশটি দেবীদাসবাবুর অনুবাদ থেকে নেওয়া।

ছিল। মহাত্মা গান্ধীর খুব প্রিয় একটা গান, বোধহয় 'রামধুন' সেটা সুরেশ খুব ভাল গায়—

রঘুপতি রাঘব রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম...'

বিভূতিভূষণের অনেকগুলি গল্প আছে শিক্ষক ও শিল্পীদের নিয়ে। এখানেও লেখক মুখ্যত সারল্য-সন্ধানী। তবে এদের সারল্যের সঙ্গে ভাবুকতা বা জ্ঞানসাধনা যুক্ত থাকায় বিভূতিভূষণ এই জাতীয় চরিত্রগুলি সম্পর্কে অত্যন্ত প্রীতি বোধ করতেন। তাঁর বহু চরিত্র একাধারে শিল্পী ও শিক্ষক—ঠিক যেমন ছিলেন তিনি নিজে।

বিভূতিভূষণের শিল্পীরা প্রায়ই নির্লোভ, নিষ্কাম। * 'কুশল পাহাড়ী'তে দুটি গল্প আছে শিল্পী-বিষয়ক—'ঝড়ের রাতে' এবং 'আর্টিস্ট'। 'আর্টিস্ট' গল্পের নায়ক ভিখিরি অবাইদাস বোষ্টমের ছেলে অশ্বিনী, সে যাত্রা-দলের বড় পাখোয়াজ বাজিয়ে। এ ছাড়া বাকী প্রায় সব শিল্পীই সাহিত্যশিল্পী। 'কবি কুণ্ডু মশায়' (গল্প-পঞ্চাশৎ) এবং 'রামতারণ চাটুজ্যে, অথর' (গল্প-পঞ্চাশৎ), নামেই প্রকাশ, উভয়েই সাহিত্যিক। 'বন্দী'-র (গল্প-পঞ্চাশৎ) যুবক নায়কও উপন্যাস লেখে। বিভূতিভূষণ মনে করেন যে এই সব সাহিত্যিকদের 'প্রকৃত কবিমন, কল্পনার উদার প্রসার ছন্দের বা কোনও শব্দের সৌন্দর্য সম্বন্ধে জ্ঞান' যথেষ্টই আছে। কিন্তু যা এদের নেই সে হচ্ছে 'বর্তমানের উপযোগী বিষয় নির্বাচনের ক্ষমতা।···ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের, দাশরথি রায়ের প্রভাব তারা আজও কাটিয়ে উঠতে পারে নি।' কিন্তু বিভূতিভূষণ এদের অবহেলা করতে চান না, বরং এদের প্রতি তাঁর একটা প্রীতিই আছে। কারণ তিনি জানেন, 'এরা

---

* উপন্যাসের ক্ষেত্রে আরণ্যকের ধাতুরিয়া, বেঙ্কটেশ্বর ও যুগলপ্রসাদও অনেকটা এই জাতীয় চরিত্র। একজন নৃত্যশিল্পী, একজন কবি আর একজনকে কি বলা যায়? পুষ্পশিল্পী?

সরস্বতীর নিঃস্বার্থ সেবক, এরা যশ পায় না, অর্থ তো পায়ই না—লেখার নেশায় লিখে যায়, যশের পরিবর্তে পায় অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের ব্যঙ্গবিদ্রূপ—'

এই জাতীয় 'সরস্বতীর নিঃস্বার্থ সেবক' সাহিত্য-জীবনের একেবারে গোড়ার দিকেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'অপরাজিত'-তে ঠিক এই ধরণের একটি চরিত্র আছে। তার নাম আজবলাল ঝা। সে উভয় অর্থেই সরস্বতীর সেবক—সে কবি ও শিক্ষক। কিন্তু টোল তার চলে না, তার কাব্য কেউ পড়ে না। নানা স্থানে ঘুরে কোথাও বিশেষ সুবিধে করতে না পেরে সম্প্রতি একটি ডাকবাংলোয় আজ সাত-আট বছর 'বনবাস করিতেছে।' তার নির্জন জীবনে কাব্যই একমাত্র সঙ্গী। বিভূতিভূষণের অন্যান্য সাহিত্যিকের মত আজবলাল ঝা-ও 'একটু বেশী বকে, বিদ্যাটা যেন বেশী জাহির করিতে চায়—কিন্তু এত সরলভাবে করে যে, দোষ ধরাও যায় না।' এ লোকটিও 'বর্তমানের কোনও ধার ধারে না। প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষায় একেবারে ডুবিয়া আছে।' অপুর খুব সুন্দর লাগল 'এই নিরীহ অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটির কথাবার্তা ও তাহার আগ্রহভরা কাব্যপ্রীতি—এই নির্জন বনবাসেও একটা শান্ত সন্তোষ। কোন দুঃখ নাই, কোন কষ্ট নাই।'

'অপরাজিত'-র আগে 'পথের পাঁচালী'তে প্রায় অনুরূপ একজন শিল্পীর দেখা মিলবে। আজবলাল ঝা-কে দেখে অপুর তার বাবার কথা মনে পড়েছেঃ 'একটি অদ্ভুত ধরণের দুঃখ ও বিষাদ অপুর হৃদয় অধিকার করিল। কত কথা মনে আসিল, তাহার বাবা এই রকম গান ও পাঁচালী লিখিতেন তাহার ছেলেবেলায়, কোথায় গেল সে সব? যুগ যে বদল হইয়া যাইতেছে, তাহা ধরিতে পারে না।...কে আজকাল ইহার আদর করিবে? অথচ কত

ঐকান্তিক আগ্রহ ও আনন্দ ইহাদের পিছনে আছে।'

শিক্ষক আজবলাল ঝা-র সঙ্গে 'আরণ্যক'-এর শিক্ষক মটুকনাথের কিছুটা সাদৃশ্য আছে।

'শাবলতলার মাঠ'-এর (গল্পপঞ্চাশৎ) উমাচরণ মাষ্টারও কবি। এই সব গল্পে শিক্ষক-জীবনের সমস্যার বিশেষ ছায়াপাত হয় নি। বরং 'বিধু মাষ্টার'-এর (বিধুমাষ্টার) দারিদ্র্যের মধ্যে এ কালের শিক্ষক জীবনের সমস্যার ঈষৎ আভাস আছে। 'অনুবর্তন' উপন্যাসেও লেখক এই সমস্যার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়েছেন।

দূরকে জানার তীব্র আগ্রহ ছিল বিভূতিভূষণের। দেশ-পরিক্রমা ও মানসভ্রমণে তাঁর সাহিত্যের দেশ-কালের সীমা সুবিস্তৃত। উত্তর ভারতের গ্রাম-নগর-অরণ্যে তার ভৌগলিক বিস্তার, আর অতীতের বৌদ্ধ যুগ থেকে তার কালসীমা সুরু, ঊনিশ শতকের ইছামতী পেরিয়ে বর্তমানে তার উত্তরণ। আর 'দেবযানে' বিভূতিভূষণ দেশকালাতীত রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছেন।

কিন্তু এই দেশ-কাল-বিস্তৃত পরিধির মধ্যমণি সমসাময়িক গ্রাম-বাংলা। বাংলাদেশের গ্রামজীবনের এত খুঁটিনাটি পরিচয় বোধহয় আর কারুর লেখাতেই পাওয়া যায় না। কিন্তু লেখক গ্রামকে ভালবাসলেও গ্রামের মধ্যে আবদ্ধ নন। তাঁর দূর-তৃষিত মন জীবনকে বৃহত্তর

* প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিভূতিভূষণ তাঁর শিল্পীজীবনের কাজটাকে পিতার অসম্পূর্ণ কর্মের সম্পূর্ণতা-সাধন বলে মনে করতেন। তৃণাঙ্কুরে (পৃঃ ৮) বিভূতিভূষণ বলেছেন: 'আজ বই (পথের পাঁচালী) বেরুল। এতদিনের সমস্ত পরিশ্রম আজ তাদের সাফল্যকে লাভ করেছে দেখে আমি আনন্দিত। প্রবাসী অপিসে বসে এই কথাই কেবল মনে উঠছিল যে আজ মহালয়া, পিতৃতর্পণের দিনটা, কিন্তু আমি তিল-তুলসী তর্পণে বিশ্বাসবান নই—বাবা রেখে গিয়েছিলেন তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করবার জন্যে, তাই যদি কর্তে পারি, তার চেয়ে সত্যতর কোনো তর্পণের খবর আমার জানা নেই।"

পাত্রে পান করাবার জন্য উদগ্রীব। গ্রামে কিন্তু একদল মানুষ আছে যারা গাঁয়ের চৌহদ্দীর বাইরে পা বাড়াল না কোনদিন, এদের প্রতি লেখকের মনোভাব ব্যঙ্গ বা পরিহাসের নয়। বরং এদের জন্যে তাঁর আছে সস্নেহ করুণা। তাদের বন্দীদশায় লেখক নিজে ব্যথিত, কারণ এই বন্দীরা জীবনের এক বৃহৎ আনন্দ থেকে বঞ্চিত। এদের জন্যে সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে 'বন্দী' (গল্প-পঞ্চাশৎ), 'বেচারী' (গল্প পঞ্চাশৎ) 'সার্থকতা' (যাত্রাবদল) প্রভৃতি গল্পে। 'বন্দী' এবং 'বেচারী' প্রায় একই গল্প। তু'যায়গাতেই নায়ক গ্রামসীমার গণ্ডী পেরোতে ব্যগ্র, অথচ তাদের মনের কোথায় যেন একটা শেকল পরানো আছে। এই অসঙ্গতি একজনকে করেছে অসহায় হতভাগ্য, আর একজনকে করেছে উন্মাদ।

'সার্থকতা'য় পঞ্চু মুখুয্যের 'দেখি-এবার-বেরিয়ে' মনোভাবের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ে-সফল ননীর জীবনের ব্যর্থতার প্রসঙ্গটিও বিপরীত দিক থেকে দেখানো হয়েছে। আর্থিক সাফল্যের অন্তরালে 'ভেতরের সম্পদ' ততটা পায় নি সে, পেয়েছে 'বাইরের পালিশ মাত্র।' ননীর প্রতিও লেখকের সহানুভূতি কম নয়। ননী ও পঞ্চু তুজনে জীবনের তুটো ভিন্ন দিক থেকে বঞ্চিত।

ননী কয়েক দিন গ্রামে থেকে আর্থিক সাফল্যের ঔজ্জ্বল্যে সবার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে ; তার থেকেও অনেক গভীর ঔজ্জ্বল্য শ্রীপতির বৌর (কিন্নরদল), সে কয়েক মাসের জন্য বদ্ধ অন্ধকার গ্রামজীবনে একটুকরো স্বর্গের প্রতিষ্ঠা করেছে তার প্রতিভা সুরুচি ও আত্মীয়তা দিয়ে। মৃত্যু এসে সেই স্বর্গপ্রাণকে নিভিয়ে দিয়েছে, গ্রাম আবার ফিরে গিয়েছে তার বদ্ধ নিরানন্দ অন্ধকার বিবরে। কিন্তু এ তো আর পুরনো সেই গ্রাম নয়, এ যে স্বর্গের স্বাদ পেয়েছে ইতিমধ্যে। সে-স্বাদ ভোলবারও নয়, নতুন করে রচনার সাধ্যও নেই। স্মৃতির উদ্বোধনে গল্পের পরিণতি বেদনা-ভারাতুর।

'মৌরীফুল'-ও গ্রামের মেয়ে ও সহরের মেয়ের সাক্ষাৎকারের গল্প। 'কিন্নরদলে' প্রধান চরিত্র সহরের মেয়ে, 'মৌরীফুলে' প্রধান চরিত্র গ্রামের মেয়ে। বস্তুত 'কিন্নরদলে'র শান্তি চরিত্রটিকে গুরুত্ব দিয়ে এঁকে শ্রীপতির বৌকে অপেক্ষাকৃত গৌণ স্থানে আনলে ভাববস্তুর দিক দিয়ে তা অনেকটা 'মৌরীফুলে'র কাছে আসবে। 'ঢের ঢের মেয়েমানুষ দেখিছি, অমন লংকাপোড়া ব্যাপক যদি কোথাও দেখে থাকি, ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার, বাবা, বাবা।'—এই বাক্যি নিয়ে শান্তি প্রথম আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছিল, তারপরে তার কী গুরুতর রূপান্তরই না ঘটল একটু সস্নেহ সুরুচির স্পর্শে! সুশীলাও একগুঁয়ে ও ঝগড়াটে, তারও দরকার ছিল একটু স্নেহস্পর্শের। সেটুকু পেলে সে যে কতদূর সুশীলা হতে পারে তার প্রমাণ ঐ একটি দিনের নৌযাত্রায় আছে। কিন্তু সেটা তার জীবনে একটি দিনই মাত্র এসেছিল, তাই সুশীলার 'মৌরীফুল'-পরিচয় শ্বশুরবাড়ীর লোকজনের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেল চিরদিনের জন্যে, অথচ এটাই তার সবচেয়ে বড় পরিচয়। এইখানেই গল্পটির ট্র্যাজেডী যে 'মৌরীফুল' হতে পারত, তার পরিচয় রয়ে গেল অলক্ষ্ম নামে।

সাধারণ মানুষ, আকাঙ্খাও তার সাধারণ; কিন্তু সেই তুচ্ছ আশাও অপূর্ণ থেকে যায়। রাজ্য ভাঙা-গড়ার মত বিরাট ঘটনা নয়, ট্র্যাজিক নায়কের সংগ্রাম-বেদনা-মথিত জীবন-মহিমা হয়তো এর নেই। তবু তুচ্ছ আশা আর তার ব্যর্থতা ঐ সাধারণ ব্যক্তিটির কাছে কম নয়। বিভূতিভূষণের কাছেও তার আবেদন গভীর। গ্রামের মেয়ে সহরে এসেছে বৌ হয়ে, তার ইচ্ছে স্বামীর অফিসের থিয়েটার দেখা (থিয়েটারের টিকিট—গল্পপঞ্চাশৎ), কোন অশিক্ষিতা কিশোরীর কামনা তার ভাবী স্বামী যেন ম্যাট্রিক পাশ করে (গায়ে হলুদ—গল্প-পঞ্চাশৎ), কারুর সারা জীবনের আকাঙ্খা একটা মাথা গোঁজবার মত বাড়ীর (ভণ্ডুলমামার বাড়ী—যাত্রাবদল), কারুর সাধ

পুঁইশাকের (পুঁইমাচা), কারুর বা বাটি চচ্চড়ির (বাটি চচ্চড়ি —কিন্নরদল)। সকলেরই এই সব সামান্য কামনা কোন না কোন ভাবে খণ্ডিত। থিয়েটারের লাল টিকিট, বাড়ীটা, পুঁইমাচা, আলু আর বাটি পরে ব্যর্থতার স্মৃতিকে জাগিয়ে বেদনাকে আরো গভীর করেছে।

পূর্ব-প্রণয় বা মিলন-সম্ভাবনার স্মৃতিকে জাগিয়েছে 'পারমিট' (গল্পপঞ্চাশৎ), 'বিড়ম্বনা' (গল্পপঞ্চাশৎ), 'চিঠি' (আচার্য কৃপালনী কলোনী), 'বাঁশী' (বেণীদির ফুলবাড়ী)।

স্মৃতির রাজ্যে ডুব দিয়ে তার আনন্দ-বেদনার স্বাদ পান করতে ভালবাসেন বিভূতিভূষণ। তাই শুধু উপরে উল্লিখিত গল্পগুলিই নয় আরো বহু স্থানে দেখা যাবে, গল্পের পরিসমাপ্তি কালে অন্তত পুরাতন স্মৃতিকে তিনি একবার জাগিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। 'দুর্মতি'তে ব্রেসলেট ও 'সঞ্চয়ে' আঠেরো টাকা সাত আনা পূর্বস্মৃতিকে তীব্রভাবে জাগিয়েছে। 'কিন্নরদলে' রেকর্ড-টা এই কাজ করেছে। এটা বিভূতিভূষণের বহু গল্পে একটা বিশেষ রীতিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

লঘু মিষ্টি রোমান্সের গল্প 'বাকস-বদল' (গল্পপঞ্চাশৎ)। 'ঠাকুরদার গল্প'-কেও (গল্পপঞ্চাশৎ) প্রায় এই দলেই ফেলা যায়।

তাঁর রোমান্স-জাতীয় লেখার মধ্যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত গল্পের উৎকর্ষ বেশী। যথা, 'মেঘমল্লার'।

'মেঘমল্লার' ছাড়া আরো কয়েকটি গল্প আছে ইতিহাসের পটে লেখা। 'দাতার স্বর্গ' (মৌরীফুল), 'প্রত্নতত্ত্ব' (মৌরীফুল), 'স্বপ্ন-বাসুদেব' (গল্প-পঞ্চাশৎ), 'শেষলেখা' (কুশল পাহাড়ী) প্রভৃতি।

এই ধরণের গল্পগুলিতে অবশ্য ইতিহাস খুবই ক্ষীণ ; লেখকের রোমান্স-কল্পনাই এগুলির প্রাণ। স্মৃতিচর উজানী মন তাঁর। স্মৃতি যতদূর স্পষ্ট, ততদূর তো স্বচ্ছন্দেই যাওয়া যায় ; তারও পেছনে

যেতেই বা বাধা কি, কপালে যখন সেই তৃতীয় নেত্রটা আছে, যে নেত্র শুধু বস্তুর অবস্তক সৌন্দর্যকে দেখায় না, অদেখা বস্তুকেও জীবন্ত করে তুলতে পারে। আমাদের জীবন-পরিধির স্মৃতিও কি সবটুকু স্পষ্ট করে মনে থাকে, সে-ও কল্পনার রসে সঞ্জীবিত নতুন এক জগৎ। জীবন-পরিধির বাইরেও স্মৃতিচর উজানী মনটাকে ছড়িয়ে দিয়ে লেখক ঐ কল্পনা-রসটাই প্রধান করে তুলেছেন। বিভূতিভূষণ তাঁর 'আরণ্যকে' বলেছেন, 'ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়া লাভ কি ? কি সুন্দর ছায়া এই শ্যাম বংশীবটের, কেমন মন্থর যমুনা জল, অতীতের শত শতাব্দী পায়ে পায়ে পার হইয়া সময়ের উজানে চলিয়া যাওয়া কি আরামের।' এই গল্পগুলির মূলে সময়ের উজানে শত শতাব্দী পার হবার রোমান্টিক আগ্রহ। তাই স্বভাবতই ইতিহাস এখানে অতি গৌণ, রোমান্স-প্রেরণা মুখ্য।

আর একটা লক্ষণীয় বিষয়, প্রধানত ইতিহাসের বৌদ্ধ যুগই লেখককে অনুপ্রাণিত করেছে ; প্রায় সব গল্পেরই আবহাওয়া বৌদ্ধ।

বিভূতিভূষণের বুদ্ধপ্রীতির নিদর্শন তাঁর সাহিত্য-জীবনের গোড়া থেকে কিছু কিছু পাওয়া যায়। 'অপরাজিত'-র একটি অংশ এই রকম ঃ 'অপুর যদি কাহারও উপর শ্রদ্ধা থাকে তবে তাহার আবাল্য শ্রদ্ধা এই সত্যদ্রষ্টা মহাসন্ন্যাসীর উপর। ছেলের নাম রাখিয়াছে অমিতাভ।...মনে পড়ে সেই অপূর্ব রাত্রি, নবজাত শিশুর চাঁদমুখ ...ছন্দক...গয়ার জঙ্গলে দিনের পর দিন সে কি কঠোর তপস্যা।... রাজা শুদ্ধোদনের কপিলাবস্তুও মহাকালের স্রোতের মুখে ফেনার ফুলের মত কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, কোন চিহ্নও রাখিয়া যায় নাই, কিন্তু তাহার দিগ্বিজয়ী পুত্র দিকে দিকে যে বৃহত্তর কপিলাবস্তুর অদৃশ্য সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন—তাঁর প্রভুত্বের নিকট এই আড়াই হাজার বৎসর পরেও কে না মাথা নত করিবে ?' (পৃঃ ২৬৬-৬৭)।

'দাতার স্বর্গ' অনেকটা পৌরাণিক গল্পের লক্ষণাক্রান্ত। তাছাড়া

অন্তর্নিহিত রূপক-অর্থটুকুই এর মূল বক্তব্য। 'শেষ লেখা'-রও উদ্দেশ্য যেন লেখকের একটি বক্তব্যকে প্রকাশ করা। সত্যকার জ্ঞান হলে জাগতিক প্রেমের প্রতি আর মোহ থাকে না—এই যেন গল্পটির মর্‍্যাল। বিভূতিভূষণ তাঁর শেষ জীবনে আধ্যাত্মিকতার দিকে খুব বেশী ঝুঁকেছিলেন। তার প্রমাণ শুধু 'দেবযান' নয়, এই শেষ গল্পগ্রন্থ 'কুশল পাহাড়ী'র 'শেষ লেখা' ছাড়াও এই বইয়ের অন্য কতগুলি গল্পে তার পরিচয় আছে।

'মেঘমল্লার' ও 'প্রত্নতত্ত্ব' দুটোই মূলত সরস্বতীর গল্প। 'মেঘমল্লারে' সরস্বতী সৌন্দর্যের কলাদেবী, 'প্রত্নতত্ত্বে' জ্ঞানদেবী। 'মেঘমল্লারে' সরস্বতী বন্দিনী—তার বেদনায় আপ্লুত এ কাহিনী। 'প্রত্নতত্ত্বে' সরস্বতী ন' শো বছর মাটিচাপা থাকবার পর তার মুখে হাসি ফুটেছে। 'মেঘমল্লারে' সরস্বতী বন্দিনী থাকবার ফলে সমগ্র কলাজগতে বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে। 'প্রত্নতত্ত্বে' সরস্বতী সমাধিস্থ থাকাতে যেন চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন দীপঙ্কর। একটি গল্পে সরস্বতীর মুক্তির মূল্য দিয়েছে প্রদ্যুম্ন—সে প্রস্তরীভূত হয়েছে। আর একটি গল্পে মাটি-চাপা সরস্বতীর মুখে হাসি ফোটাতে স্থকুমার শুনেছে সহকর্মীদের টিটকিরি—'চাকরিবাজী!' প্রদ্যুম্ন ও স্থকুমার বহির্জগতে তিরস্কৃত বা ব্যর্থ, অন্তর্জগতে তারা পুরস্কৃত, জ্ঞান ও সৌন্দর্যের ব্যাপ্তিতে তাদের সিদ্ধি। জ্ঞানের রাজ্যে স্থকুমার উত্তরসূরী, দীপঙ্কর তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আর প্রদ্যুম্নের বিরাট আত্মত্যাগে যেন বিভূতিভূষণ স্বয়ং সশ্রদ্ধ। যারা কলাদেবীকে নিজেদের নীচ স্বার্থ ও প্রলোভনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায়, তাদের প্রতি বিভূতিভূষণের বিরাগ, আর যারা সর্বস্ব ত্যাগ করে সরস্বতীর বিশুদ্ধ প্রাণসৌন্দর্যকে রক্ষা করবার জন্য, সেই সত্যকার শিল্পীদের প্রতি বিভূতিভূষণের মাথা আনত। এই প্রসঙ্গে 'উডুম্বর' গল্পটি উল্লেখযোগ্য। এখানে অর্থলোভী ও সস্তা যশের প্রত্যাশী লেখকদের ঠাট্টা করেছেন বিভূতিভূষণ।

'স্বপ্ন-বাসুদেব'-এর কাহিনীটি নিয়ে পরবর্তী কালের একজন লেখক আর একটি গল্প লিখেছেন। রমাপদ চৌধুরীর 'হেলিওডোরাস ও মাধবিকা' (রূপযানী) ও 'স্বপ্ন-বাসুদেব' প্রায় একই গল্প। উভয়ের উৎস বোধহয় একটিই বই—'ভারতের দেবদেউল'। লেখক জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত এই গ্রন্থে কাহিনীটির কাঠামো দেওয়া আছে। দুজনেই অবশ্য নিজের মত সামান্য পরিবর্তন করেছেন তাঁদের গল্পে।

বিভূতিভূষণের 'স্বপ্ন-বাসুদেবে' নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎকার বেশ নাটকীয়। গল্পের প্রথম অংশে একটা কাব্যিক পরিবেশ সৃষ্টিরও চেষ্টা আছে। হেলিওডোরাস যুদ্ধ উপলক্ষ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর থেকে দীর্ঘ অংশটি ক্লান্তিকর। পরিণতিতে রয়েছে খুব সাধারণ রোমান্টিক কল্পনার পরিচয়। অতিলৌকিক-প্রীতির বশে বিভূতিভূষণ বাসুদেবকে দিয়ে স্বপ্নে রাজাকে আদেশ করিয়ে বিবাহ ঘটিয়েছেন, ফলে নায়ক-নায়িকার প্রেমে তাদের সক্রিয় ভূমিকা গৌণ হয়ে গিয়েছে। উভয়ের বিরহ-বেদনা ও সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা এই প্রেমকে অবশ্য কিছুটা মহিমা দিয়েছে।

রমাপদ চৌধুরীর গল্প 'হেলিওডোরাস ও মাধবিকা'-য় হেলিও-ডোরাস মালোয়া-রাজপুত্রের বন্ধু এবং শান্ত যুবক। বিভূতিভূষণে হেলিওডোরাস উদ্ধত ভারত-বিদ্বেষী যুবক। বিভূতিভূষণ তাকে বাসুদেব-ভক্ত করিয়ে তৃপ্তি পেয়েছেন; এখানে প্রেম হেলিওডোরাসের মনে বাসুদেব-ভক্তি এবং ভারত-প্রীতি ঢুকিয়ে দেওয়ার উপায় যেন। প্রেমকে বিভূতিভূষণ একক অনন্য-নিরপেক্ষ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেন নি। বিভূতিভূষণে প্রেম ভক্তির সোপান, এবং সেটা এসেছে আকস্মিকভাবে অলৌকিক পথে। রমাপদ চৌধুরীর গল্পে প্রেম এসেছে সাধনার পথে। রমাপদ প্রেমকে গুরুত্ব দিয়েছেন বেশী, ভক্তিকে নয়, অতিলৌকিক অংশকে নয়। হেলিওডোরাসের দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর সাধনা প্রধানত প্রেমের জন্য। সেই সাধনা তাকে ভাবের উচ্চলোকে নিয়ে

গিয়েছে—সেখানে বিবাহের অর্থ তার কাছে সাধারণ বিবাহ থাকে নি।

বিভূতিভূষণের গল্পে বিবাহ ঘটাচ্ছেন বাসুদেব; বাসুদেবের অলৌকিক মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় গল্পরস শেষ দিকে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অবশ্য, গল্পের নামেও বোঝা যাবে, বিভূতিভূষণের লক্ষ্য ছিল বাসুদেব, আর রমাপদর লক্ষ্য নায়ক-নায়িকা।

গল্পের ভাষা বিভূতিভূষণে ভাল, আর ঘটনাবিন্যাস রমাপদতে সংহত।

দূর-অতীতের-পটে বিধৃত এই গল্পগুলিতে অতিপ্রাকৃতের ছায়াপাত ঘটেছে। আর কতগুলি গল্প আছে যেখানে অতিপ্রাকৃত বিষয়বস্তু বর্তমানের পটেই বিধৃত। যথা, 'হাসি' (মৌরীফুল), 'খুঁটিদেবতা' (মৌরীফুল), 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প' (জন্ম ও মৃত্যু; কিন্নরদল), 'পেয়ালা' (যাত্রাবদল) 'পৈতৃক ভিটা' (গল্প-পঞ্চাশৎ), 'নুটি মন্তর' (গল্প পঞ্চাশৎ), 'কাশী কবিরাজের গল্প' 'বিরজা হোম ও তার বাধা' ইত্যাদি। শুধু গল্প-সংখ্যা দেখেই বোঝা যায়, বিভূতিভূষণ তাঁর সমসাময়িকদের তুলনায় এই বিষয়টার প্রতি অনেক বেশী মনোযোগ দিয়েছিলেন। শুধু গল্পে নয় বহু উপন্যাস ও ডায়রীতেও তার চিহ্ন বর্তমান। অতিলৌকিক জগৎ সম্বন্ধে তাঁর একটা সরল বিশ্বাস ছিল, যা এ যুগের মানুষের পক্ষে দুর্লভ। তিনি এ জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করেন নি কোন দিন, কোন সন্দেহ ছিল না তাঁর মনে। * এই সরল বিশ্বাসের স্বর্গ লোক থেকে আজকের

* বিভূতিভূষণ অতিপ্রাকৃত ঘটনাকে অসম্ভব বা অবাস্তব মনে করতেন না; সেগুলি কোন কোন লোকের অভিজ্ঞতার বাইরে এই মাত্র। 'রুক্মিনী দেবীর খড়্গ' গল্পের সুরুতে লেখক বলেছেন: 'জীবনে অনেক জিনিষ ঘটে, যাহার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তাহাকে আমরা প্রতিপ্রাকৃত বলিয়া অভিহিত করি। জানি না, হয়তো খুঁজিতে জানিলে তাহাদেরও সহজ ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণ বাহির করা যায়। মানুষের বিচার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতালব্ধ কারণগুলি ছাড়া অন্য কারণ হয়তো তাহাদের থাকিতে পারে—ইহা লইয়া তর্ক উঠাইব না—শুধু এইটুকু বলিব, সেরূপ কারণ যদিও থাকে—আমাদের মতো সাধারণ মানুষের দ্বারা তাহার আবিষ্কার হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই, তাহাদিগকে অতিপ্রাকৃত বলা হয়।'

প্রায় সব লোকই চ্যুত। কেউ তাদের মতলোকের মাটি ধরবার চেষ্টা করছে, কেউ বা মর্তস্তরে ত্রিশংকু। নিরংকুশ বিশ্বাসের স্থান জনমানসে আজ সংকীর্ণ। তাই এ জাতীয় গল্প লিখতে গেলে আধুনিক লেখকরা বিশেষ ধরণের আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করেন, যে-আবহাওয়া পাঠকের মনে একটা সূক্ষ্ম শিহরণ জাগায়; অথবা বিশেষ কোন মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপরে অতিপ্রাকৃত সূক্ষ্ম জগৎকে গড়বার চেষ্টা করেন (যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে' গল্পটির অতিপ্রাকৃত আবহাওয়ার ভিত্তি স্বামীটির অপরাধবোধ)। কিন্তু বিভূতিভূষণ সাম্প্রতিক কালের এই সব কলাকৌশলের উপর বিশেষ নির্ভর করেন নি। যেন তিনি ধরেই নিয়েছিলেন, পাঠকরাও তাঁর মত সরল মনে সব কিছু বিশ্বাস করবে। ফলে সূক্ষ্ম কলাকৌশলের দিকে তাঁর নজর ছিল না। কিন্তু তার জন্যে গল্পগুলি যথেষ্ট উঁচু স্তরে উঠতে পারে নি। 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর আবহাওয়া, 'নিশীথে'-র মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি, 'মাষ্টার মশাই'-এর প্রথম অংশের অস্বস্তিকর শিহরণের তুল্য কিছু বিভূতিভূষণে অনুপস্থিত। 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্পে' তবু আবহ-সৃষ্টির কিছু চেষ্টা আছে, অন্যত্র তাও প্রায় নেই।

বিভূতিভূষণের এই জাতীয় গল্পের আর একটি বিশেষত্ব, তাঁর অশরীরীদের অনেকেই বেশ স্নিগ্ধস্বভাব। 'পৈতৃক ভিটা' গল্পের লক্ষ্মী নামক অতিলৌকিক মানবীর কী অপরূপ শান্তিময় সস্নেহ রূপ। 'কাশী কবিরাজের গল্পে'র সেই মমতাময়ী মা-ও এর উদাহরণ। বিভূতিভূষণ যেন অতিপ্রাকৃত শক্তিকে মঙ্গলকারী হিসেবেই মনে করেন। এই গল্পগুলি অতিপ্রাকৃত আবহ-রচনায় বিশেষ সার্থক না হলেও লেখকের বিশ্বাসের আন্তরিকতা ও স্নিগ্ধ চরিত্র অঙ্কনে দক্ষতার জন্য মোটামুটিভাবে সুখপাঠ্য।

অতিপ্রাকৃত শক্তি যেখানে অমঙ্গলবাহী ও ভীতিকর তেমন গল্পও অবশ্য বিভূতিভূষণে একেবারে অনুপস্থিত নয়। যথা, 'হাসি',

'বিরজা হোম ও তার বাধা' ইত্যাদি। তবে এ গল্পগুলিও উৎকর্ষ-বিচারে খুব উঁচু যায়গায় স্থান পাবে না।

'ডাইনী' (কিন্নরদল) ঠিক অতিপ্রাকৃত গল্প নয়। আমাদের একটি অর্থহীন কুসংস্কারের উপর এর ভিত্তি। একদিকে সন্তানহীনা নারীর বেদনা, অন্যদিকে আশপাশের মেয়েদের তাকে ডাইনী হিসেবে সন্দেহ—এই পরিস্থিতিই গল্পটির উপজীব্য। ঠিক একই বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা তারাশঙ্করের একটি গল্প আছে। গল্পটির নাম 'ডাইনীর বাঁশী'। বিভূতিভূষণের গল্পের পটভূমি শহর, আর তারাশঙ্করের গ্রাম। অনুভূতির তীব্রতায় তারাশঙ্করের গল্পটি নিঃসন্দেহে অনেক ভাল।

পূর্বে বিভিন্ন ধারায় যে-গল্পগুলির উল্লেখ করেছি সেগুলি বিভূতিভূষণের বিশেষ ধরণের মানসপ্রবণতার স্বাক্ষরবাহী। কিন্তু এ ছাড়াও এমন কতগুলি গল্প আছে যাকে মোটামুটিভাবে বলা যায় 'ব্যতিক্রম'। অর্থাৎ তাঁর উপন্যাস-ডায়েরী ইত্যাদির মধ্যে বিভূতিভূষণের এই ধরণের মনের পরিচয় প্রায় নেই বললেই চলে।

নিষ্ঠুরতার কাহিনী বিভূতিভূষণ লিখতে চান না। ওটা তাঁর কোমল কল্পনাপ্রবণ মনের অনুকূল নয়। দুঃখের কাহিনী যেখানে এঁকেছেন, সেখানেও তা এক ভাব-রসে জারিত, যার ফলে তাঁর কাছে 'সুখ ও দুঃখ দুইই অপূর্ব রোমান্স্'। কিন্তু দুঃখ যেখানে রোমান্সের স্বাদ আনে না, বরং তার তীব্রতা পাঠকের মনে একটা অসহায় যন্ত্রণার সৃষ্টি করে, এমন কয়েকটি গল্প তিনি লিখেছেন। যথা 'মুক্তি' (গল্পপঞ্চাশৎ), 'ডানপিটে' (যাত্রাবদল) ইত্যাদি। 'মুক্তি'-র নিস্তারিণী ও 'ডানপিটে'র সতীশ যৌবনে যথেষ্ট কৃতী ছিল, বৃদ্ধ বয়সে সংসারের গলগ্রহ হয়ে পড়েছে, আর অক্ষম মানুষ দুটি দু' মুঠো ভাতের জন্য নিত্য নিগ্রহ সহ্য করে। (সংসার-গলগ্রহের চিত্র ইন্দির-ঠাকুরুণেও আছে।) এই নিগ্রহের একটানা বর্ণনা

গল্প দু'টিতে। নিস্তারিণীর মুক্তি ঘটেছে মৃত্যুতে, আর সতীশ কৈশোর-স্মৃতির কাশীতে এসে নিঃস্বতার মধ্যেও এক ধরণের মুক্তি পেয়েছে। এই গল্পগুলির দুঃখচিত্রে স্মৃতি রোমন্থনের স্বাদ নেই, আলো-আঁধারি মায়ায় ঈষৎ বেদনা-মিশ্রিত আনন্দানুভবের রূপকথা এ নয়। এখানে একটানা হৃদয়হীনতার কাহিনী—অনেক যায়গায় এ আতিশয্য পাঠকের কাছে গুরুভার মনে হয়। এবং শুধু এই কারণেই এই গল্পগুলির এক ধরণের ব্যর্থতা আছে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে এই হৃদয়হীনতার বর্ণনার মূলে কাজ করেছে নিগৃহীতের প্রতি লেখকের সহানুভূতি।

হৃদয়হীনতার বিপরীত হিসেবে যেখানে সহৃদয় একটি শক্তি সক্রিয়, সেখানে গল্পের ভারসাম্য অনেক বেশী বজায় থেকেছে, এবং গল্পগুলির বিরুদ্ধ দুটি স্রোত বৈপরীত্যের গুণে ভাল খুলেছে; এসব যায়গায় পাঠক ক্লিষ্ট হয়নি, অথচ গল্পের বেদনাটা ঠিকই সঞ্চারিত হয়েছে। ('মুক্তি' ও 'ডানপিটে'-তেও মানবতার স্পর্শ আছে নির্মলা প্রভৃতি চরিত্রে, কিন্তু সেটা বিরুদ্ধ শক্তির কাছে এত ক্ষীণ যে ভারসাম্য নেই)। এই ধরণের গল্পের উদাহরণ, 'যাত্রাবদল', 'একটি দিনের কথা' (কিন্নরদল)। এই গল্পগুলিতে দুই বিরুদ্ধ স্রোত—নীচ স্বার্থপরতা ও সহৃদয় মনুষ্যত্ব—পাশাপাশি সাদা কালো রঙে বয়ে গিয়েছে ও আবেগকে আপেক্ষিকভাবে উজ্জ্বলতর করেছে।

বাস্তবের রূঢ় সূর্যালোকে রোমান্সের আদর্শ সৌন্দর্যলোকের অবসান—এই বিষয়বস্তু বিভূতিভূষণের মনোধর্মের অনুকূল নয়। তাঁর কল্পলোকের সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত নেই। বরং তাঁর কল্পজগৎ ও বাস্তবজগৎ একসঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে চলে—যেন পরস্পরের সাথী, পরিপূরক। কিন্তু 'সুহাসিনী মাসিমা' (গল্প-পঞ্চাশৎ), 'কুয়াসার রং' (বেনীদির ফুলবাড়ী) প্রভৃতি কয়েকটি গল্পে তিনি তাঁর স্বকীয় পথ ছেড়ে উলটো পথ ধরেছেন। সুহাসিনী

ও কণা সম্পর্কে 'আমি' এবং পুতুলের যে কল্পসৌন্দর্য সৃষ্টি করা ছিল, তা একবার চোখে দেখা মাত্রই বাস্তবের আঘাতে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু 'তিরোলের বালা'-র (বেনীদির ফুলবাড়ী) মত গল্প বোধহয় সমগ্র বিভূতি-সাহিত্যে আর একটিও নেই। একটি পাগলী মেয়ে উন্মত্ততার বশে তার দাদাকে হত্যা করে ফেলল—এই রক্তাক্ত ঘটনার ভীতিকর আবহাওয়ার শিহরণ গল্পটিতে সঞ্চারিত। এই গল্পে বিভূতিভূষণের সম্পূর্ণ অন্য ধরণের এক পরিচয় আছে।

'অন্নপ্রাশন' গল্পটি অস্বাভাবিক। একমাত্র শিশুসন্তানের মৃত্যুর পর তাকে সমাহিত করে প্রতিবেশীর ছেলের অন্নপ্রাশনে যাওয়া এবং বাড়ীতে এসে ঘুমিয়ে পড়া পিতামাতার পক্ষে স্বাভাবিক নয় এবং বিভূতিভূষণের নায়ক-নায়িকার কাছে অপ্রত্যাশিত। রাতে বৃষ্টিশব্দে জেগে যখন কেশব কাঁদল, তখন গল্পে স্বাভাবিকতা ফিরেছে ও বিভূতিভূষণকে চেনা যাচ্ছে।

বিভূতি-মানসে ব্যঙ্গ-প্রবণতার স্বাক্ষর বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। নিজের ভাবজগতের এমন গভীরে তাঁর স্বপ্নপ্রবণ মনের স্থিতি যে সেখান থেকে তীক্ষ্ণদৃষ্টির আলোকে বাস্তবের অসঙ্গতি লক্ষ্য করা বেশ অসুবিধা। কিন্তু কয়েকটি গল্পে তিনি এই অসুবিধা কাটিয়ে উঠেছেন, এবং ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরসের সাধনা করেছেন। তাঁর ব্যঙ্গে অবশ্য আক্রমণের তীব্রতা নেই, আছে মৃদু কটাক্ষ।

'অনুশোচনা'য় (জ্যোতিরিঙ্গণ) এক পাদরি যিনি লোকের পাপ-স্বীকার শ্রবণ করে শাস্তিবিধান করেন, যিনি দুটো কুমড়োর জালি কেউ না বলে নিলে সেটাকে 'চুরি রূপ মহাপাপ' মনে করেন, যাঁর দীর্ঘ দাড়ির দিকে তাকালে অপরাধী 'সত্যিই নিজেকে...ঘোর পাপী ও অসহায় মনে না করে পারে না', সেই পুরোহিত বালাদাস আপ্তে ডুমুর গাছের ঝাড়ের আড়ালে চোরের মত দাঁড়িয়ে

স্নানরতা সুন্দরীর নগ্নসৌন্দর্য-চৌর্যকালে ধরা পড়েছেন একজন 'অপরাধী'-র কাছে, যে-অপরাধীকে আপ্তে স্বয়ং উক্ত অপরাধে শাস্তিবিধান করেছেন সেইদিনই সকালে।

এ যেন মম্-এর 'The Rain'-এর পাদরি সাহেবের অতি-সরল সাদা-মাটা লঘু এক সংস্করণ।

এ যুগের ফিল্ম্-প্রীতির আতিশয্যকে কটাক্ষ করা হয়েছে 'উড়ুম্বর' ও 'আইনষ্টাইন ও ইন্দুবালা' (গল্পপঞ্চাশৎ) গল্পে। একটায় ঠাট্টা লেখককুলের প্রতি, আর একটায় ফিল্ম্-পাগল জনসাধারণের প্রতি। 'উড়ুম্বরে' কালিদাস ভবভূতি থেকে ব্যাস পর্যন্ত তাঁদের বইয়ের 'বাঙ্ময়-আলেখ্য' করাবার জন্য ব্যস্ত। লেখককুলের চিত্রার্পিত হবার লোলুপতা এখানে বিভূতিভূষণের পরিহাসের লক্ষ্য।

'আইনষ্টাইন * ও ইন্দুবালা'-য় বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও বাংলাদেশের এক চিত্রতারকা যদি ঘটনাচক্রে একই দিনে রাণাঘাটে

* আইনষ্টাইনের প্রতি লেখক অতি সশ্রদ্ধ ছিলেন। তাঁর ডায়রীর একাধিক স্থানে আইনষ্টাইনের নাম উল্লেখ আছে। তবে এখানে জ্বলজ্যান্ত আইনষ্টাইনকে রাণাঘাটে নিয়ে আসা কতটা সঠিক হয়েছে সন্দেহ। নামটা সামান্য পাল্টে নিলেও গল্পের ক্ষতি হোতো না। যাই হোক, এটা তবু লঘু গল্প। সীরিয়াস গল্পের ক্ষেত্রেও সর্বজনবিদিত বিষয়ের পরিবর্তন করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে একজন সমালোচক (গিরিজাপতি ভট্টাচার্য) একবার একটী অভিযোগ করেছিলেন: "গ্রহের ফের' সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এর নায়ক অধ্যাপক রাজচন্দ্রবাবুর গাণিতিক প্রতিভা প্রতিষ্ঠা করবার আগ্রহাতিশয্যে তাঁকে করা হয়েছে এক ধূমকেতুর ভবিষ্যদ্বাণীকার। লেভেরিয়ে ও অ্যাড্যাম্‌স্ কর্তৃক নেপচুন্ গ্রহের ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধ হয়ে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ থিওরীর জয়-জয়কার হয়েছিল বটে, কিন্তু ধূমকেতুর সংখ্যা অতি নির্দিষ্ট ও তাদের আবিষ্কারকদের নাম জগদ্বিখ্যাত, তার মধ্যে একটি বাঙ্গালীরও নাম পাওয়া যায় না। এ হেন গল্পের অবতারণা করে লেখক রাজচন্দ্রবাবুকে 'বিরিঞ্চি-বাবা-র সমকক্ষ করে তুলেছেন। যা অতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্যকে খণ্ডন করে বা যা সর্বজনবিদিত নজিরকে নাকচ করে তা নিয়ে গম্ভীর গল্প-উপন্যাস রচনা সম্বন্ধে আমার আপত্তি নিবেদন করি। ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দে কোন বাঙ্গালী এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গে উঠেছিল বা ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড স্কোরিং-কে পরাভূত করেছিল---এ নিয়ে কি গম্ভীরভাবে গল্প রচনা চলতে পারে?" (পরিচয়, মাঘ, ১৩৩৯)।

এসে পড়ে তবে আইনষ্টাইনের সভাগৃহে কী মর্মান্তিক শূন্যতা দেখা দেবে তার বিবরণ। এমন কি বৈজ্ঞানিকপ্রবরের সভার উদ্যোক্তারাও নানা অজুহাতে ইন্দুবালার সভাগৃহে পৌঁছেছে, এবং নগদ মূল্যে টিকিট কিনে। বিজ্ঞানসভার মূল উদ্যোক্তা একা আইনষ্টাইনকে নিয়ে মহাশূন্যতার মধ্যে বসে থেকে থেকে শেষে বৈজ্ঞানিকপ্রবরকে নিয়ে এলেন ইন্দুবালার প্রেক্ষাগৃহে বাণী সিনেমা হলে। পরদিন খবর-কাগজে রিপোর্ট বার হোলো ঃ 'গত সপ্তাহে স্থানীয় বাণী সিনেমাগৃহে সুপ্রসিদ্ধ চিত্রতারকা ইন্দুবালা দেবী শুভাগমন করেন। নৃত্যকলা-নৈপুণ্যে ও কিন্নরকণ্ঠের সঙ্গীতে তিনি সকলের মনোহরণ করিয়াছেন। বিশেষত 'কালো বাদুড় নৃত্যে' তিনি যে উচ্চাঙ্গের শিল্প-সঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন, রাণা-ঘাটবাসিগণ তাহা কোনদিন ভুলিবে না। এই উপলক্ষে উক্ত সিনেমা গৃহে অভূতপূর্ব জন-সমাগম হইয়াছিল।......বিখ্যাত জার্মাণ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন গতকল্য দার্জিলিং যাইবার পথে এখানে মিউনিসিপ্যাল হলে একটি বক্তৃতা দিতে নামিয়াছিলেন। তাঁহাকেও সেদিন বাণী সিনেমা গৃহে ইন্দুবালার নৃত্যের সময় উপস্থিত থাকিতে দেখা গিয়াছিল।'

এ কালের চিত্রতারকাপ্রীতির আতিশয্য আর একজন সমকালীন লেখকের হাসির খোরাক জুটিয়েছে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'ভক্ত' গল্পের বিষয়বস্তুও এই। চিত্রাকাশের একজন তারকা-দেবী যদি অকস্মাৎ পর্দার স্বর্গলোক থেকে একটি অখ্যাত গ্রামাঞ্চলে স্খলিত হয়ে পড়েন, তবে গদগদ-ভক্তির উপচারে 'দেবী'-র পূজাটা কেমন হয়, তার কৌতুকরসোজ্জ্বল বর্ণনা আছে এই গল্পে। এ ছাড়া আরো কয়েকটি গল্পে তারকাপ্রীতির উৎকট আতিশয্যের প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

কিন্তু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবণতা ব্যঙ্গ বা হাস্যের দিকে স্বল্প। তাঁর 'মূলো—র‍্যাডিশ—হর্স্‌র‍্যাডিশ', * 'অসমাপ্ত' প্রভৃতি

* গল্পটির কিছুটা বাস্তব ভিত্তি আছে। 'তৃণাঙ্কুর'-এ (পৃঃ ৯০—৯১) বিভূতিভূষণ লিখছেন ঃ 'যোধপুরী ছাত্রটি আমাদের নিতে এসেছিল।...এখানে পাহাড়ের ওপর দুটো বড় হ্রদ আছে। একটার নাম আন্বাজেরী আর একটার নাম কি বল্লে যোধপুরী ছাত্রটি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

গল্পেও হাস্যের উপকরণ ছিল, কিন্তু লেখক সেটুকুকে বিশেষ কাজে লাগান নি। 'মূলো' শেষ হয়েছে 'সত্যকার দুঃখ' নিয়ে। আর 'অসমাপ্ত'-র হাসিটুকুকে লেখক যেন স্বেচ্ছায়ই ফুটিয়ে তোলেন নি, আভাস মাত্র দিয়েই অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়েছেন। †

তাঁর হাস্যরসাত্মক গল্পগুলির একটা বড় ত্রুটি তাঁর ভাষা। তাঁর অন্যান্য রচনার ভাষায় যেমন বিলম্বিত লয়ের মন্থরতা ও ভাবগাম্ভীর্য বর্তমান, এই লঘুরচনাগুলির ক্ষেত্রেও তিনি তার কোন ব্যতিক্রম ঘটান নি। কিন্তু গল্পের পরিস্থিতিগত হাস্যধ্বনিকে ঠিক মত বাজিয়ে তুলতে সাহায্য করে ভাষার শাণিত দীপ্তি, অথবা তার লঘু গতি, অথবা তার ছদ্ম-গাম্ভীর্য ইত্যাদি। এ সব কলাকৌশল আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেন নি লেখক। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে সব ধরণের গল্পকেই পরিবেষণ করেছেন। এতে গল্পগুলির যতখানি সম্ভাবনা ছিল, ততখানি সার্থকতা পায় নি।

আসল কথা তাঁর মনের পক্ষে এই বিষয়গুলি খুব অনুকূল ছিল না। তবু লেখক যেন তাঁর মানস-বিচরণের সময় নেহাৎ বৈচিত্র্যের খাতিরেই তাঁর বাঁধা সড়কের বাইরে দু একবার পা বাড়িয়েছেন। আর বাঁধা সড়কের বাইরে বলেই গল্পগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

দুটোই বড় সুন্দর—অবিশ্যি আব্বাজেরী হ্রদটা অনেক বড় ও সুন্দরতর। হ্রদের সামনে কলকাতার ঢাকুরের লেককে লজ্জায় মুখ লুকোতে হয়। এক গম্ভীর মহিমার কাছে ঢাকুরিয়া লেক বাল্মীকির কাছে ভারতচন্দ্র রায়। এর কি তুলনা দেব ? ম্লান জ্যোৎস্না উঠলো। যোধপুরী ছাত্রটি লোক ভাল, কিন্তু তার দোষ সে অনবরত বকচে। প্রমোদবাবু তার নাম রেখেছেন; 'মূলো'—সে চুপ করে থাকলে আমরা আরোও অনেক বেশী উপভোগ কর্তে পারতুম।'

† এ গল্পটির মূলেও সামান্য একটি ছোট ঘটনা আছে। 'হে অরণ্য কথা কও'তে (পৃঃ ৭০৮) লেখক লিখেছেন: 'পরশু এলুম উত্তরপাড়া রাজবাড়ীতে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব সম্পন্ন ক'রে। ...বেশ মজা করে মিটিং করা গেল—ভাটপাড়ার আশালতার সঙ্গে দেখা হল অনেকদিন পরে —প্রায় আঠারো বছর পরে, ঘটে গেল জিনিষটা আমার সেই গল্পটির মত। একটি ছোট ছেলে এসে বল্লে, আপনাকে আমার মা ডাকছেন।...ঠিক একটি ছোট গল্প। কিছুদিন আগেই এ গল্প আমি লিখেছি কি একটা কাগজে।'

সপ্তম অধ্যায়

রচনারীতি

॥ এক ॥

॥ আঙ্গিক ॥

এ কালের কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে বনফুল বোধহয় সবচেয়ে আঙ্গিক-সচেতন; আঙ্গিক নিয়ে তাঁর পরীক্ষার অন্ত নেই। প্রায় প্রতিটি গ্রন্থেই তাঁর আঙ্গিক-নূতনত্বের প্রয়াস থাকে। ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও তাঁর গঠনকৌশল স্বতন্ত্র।

একজন পাশ্চাত্য সমালোচক বলেছেন, 'Here (অর্থাৎ উপন্যাসে) technique is miner's drill, and it is a peculiarity of this mine that new tools are required for every new seam.' ('Decline and Future of the English Novel,' by Philip Toynbee : New writing and Daylight, 1943—44), অর্থাৎ কথাসাহিত্যিকের প্রতি গ্রন্থেই নতুন হাতিয়ার চাই। এ বিষয়ে বনফুলের মত এতটা নিষ্ঠাবান বোধহয় আর কেউ নন। সমালোচকের এই উক্তিটির আক্ষরিক অর্থের আনুগত্য বনফুলে আছে।

বনফুলের ঠিক বিপরীত কোটীতে বিভূতিভূষণের স্থান। সাহিত্যিক-জন্মের প্রথম দিন তিনি যে-আঙ্গিকের সন্ধান পেলেন, শেষ দিনেও তাকে হাতছাড়া করবার দরকার মনে করলেন না। তাঁর হাতিয়ার একটাই। বনফুল শতায়ুধ।

নতুন বিষয়ই সাধারণত নতুন আঙ্গিক দাবী করে। বনফুলে তা নয়। তিনি হাতিয়ার ঘুরিয়ে কারিকুরি দেখান। প্রাণের পূর্ণতাকেধারণ ও প্রকাশ করে আঙ্গিক, বনফুলের আঙ্গিক বহুক্ষেত্রে শূন্যতাকে আবরিত রাখে।

আর বিভূতিভূষণ প্রথম গ্রন্থেই, জীবনবোধের যতখানি গভীরতা তাঁর ছিল, তার চরম যায়গায় এক বারেই পৌঁছে গিয়েছেন। তার পরে তিনি তাঁর প্রথম গ্রন্থের ভাবরসের মধ্যে বাকী জীবনটা কাটিয়ে গিয়েছেন। সুতরাং তাঁর আঙ্গিক-বৈচিত্র্য সম্ভব নয়। কারণ ভাবসত্যের প্রতিফলন আঙ্গিকে, সে-ভাবসত্য তাঁর অপরিবর্তিত। বৈচিত্র্যের চিন্তা দূরে থাক, তাঁর একতম রূপকল্প সম্পর্কেও তিনি সচেতনভাবে ভেবেছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁর আত্মভাব-মুগ্ধতা তাঁকে এ সব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবতে দিত না।

এই আত্মভাবমুগ্ধতার জন্যই সব উপন্যাস তাঁর প্রায় এক ধরণের একান্তভাষণ—স্বগতোক্তি। যদিও এক 'আরণ্যক' ও 'দৃষ্টিপ্রদীপ' ছাড়া প্রায় কোন উপন্যাসেই 'আমি'-র মারফৎ গল্প বলা হয় নি, তা সত্বেও সূক্ষ্মভাবে তাঁর সব বইই আত্মজীবনীমূলক—বইয়ের প্রতি পাতায় ছড়িয়ে আছেন তিনি। তাঁর সাহিত্যজীবন ও ব্যক্তিজীবনে কোন ফারাক নেই। তাঁর উপন্যাস ও ডায়রীর মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য, তাঁর উপন্যাস ডায়রীরই কল্পনা-প্রসারিত আদর্শায়িত রূপ। এই উভয় ধরণের সাহিত্য মিলিয়ে পড়লেই এ কথাটার সত্যতা বোঝা যাবে। ডায়রীর কোথাও পাওয়া যাবে কাঠ-বাঁশের কঙ্কাল-কাঠামো, কোথাও খড়-বিচুলির অর্ধপরিস্ফুট প্রত্যঙ্গ রূপ, কোথাও একমেটে আদল, কোথাও এক-রঙা সন্ধিক্ষণ, কোথাও বা বর্ণসমাবেশে সুসম্পূর্ণ প্রতিমা। খুব ভাল উদাহরণ হবে ডায়রী 'স্মৃতির রেখা' এবং উপন্যাস 'আরণ্যক'। দুখানা প্রায় একই বই মনে হয়। 'স্মৃতির রেখা'-তে যেন লেখক প্রাথমিক খসড়াটা করেছেন বা উপন্যাস রচনার মালমসলাগুলো দ্রুত নোট করে রেখেছেন ভবিষ্যতে কাজে হাত দেবেন বলে। * অবশ্য তাঁর ডায়রী নিছক রসহীন তথ্যপঞ্জী নয়, তাঁর অভিজ্ঞতা

* বিভূতিবাবুর গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে ঠিক সমান্তরালভাবে একটী ডায়রীর ধারা পাওয়া যায়। একটিতে সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ, অন্যটিতে আন্তর ইতিহাস। এদিক থেকে তিনি

কল্পনারসাশ্রয়ী, কারণ বাস্তবজীবনেও লেখক—'আমার কল্পনাজগতে আমি ডুবে থাকতে চাই' (স্মৃতির রেখা পৃঃ ৭২)।

তারপরে উপন্যাস যখন লেখা হলো তখনও সে-বই ডায়রীর কাঠামোকে পূরো ছাড়ল না। বিভূতিভূষণের উপন্যাসেই এ কথা লেখার দরকার হয়ঃ 'ইহা ডায়রী বা ভ্রমণ কাহিনী নহে, ইহা উপন্যাস।' বিভূতিভূষণ তাহলে নিজেও জানতেন যে তাঁর উপন্যাসকে পাঠকরা ডায়রী ইত্যাদি বলে ভুল করতে পারেন। 'কল্পনাও কিছু না কিছু অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে তবে শূন্যে ভর করে—' (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ৪১)। স্মৃতির রেখায় অভিজ্ঞতার অংশ প্রধান, 'আরণ্যকে' ঐ অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে কল্পনা উদ্দীপ্ত। কিন্তু 'আরণ্যক' উপন্যাস হয়েও দিন-ঘটনার সমষ্টির ধারক। উপন্যাস নিশ্চয়ই দিনপঞ্জী নয়, তাৎপর্যমণ্ডিত দিনকেই মাত্র সে গ্রহণ করে। তার বাছাই আছে। কিন্তু বিভূতিভূষণের কাছে কোন দিনই তাৎপর্যহীন নয়, কারণ প্রতি দিনই সূর্য ওঠে, আকাশে—মাটিতে আলোছায়ার খেলা চলে, লতা-পাতা-ফুল-ফল নানা কথা কয়, প্রকৃতি প্রতিদিনই অকৃপণ দাক্ষিণ্য বিতরণের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। তাই বিভূতিভূষণের উপন্যাসে, যে-ঘটনা তাঁর ভাল লাগে তাদের অবারিত আবির্ভাব। ঘটনার চরিত্র-দ্যোতকতা বা অন্য ইঙ্গিত সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা স্বল্প।

নিজের মনের মধ্যে তিনি নিমজ্জিত। পাঠক সম্পর্কে সচেতনতাও তাঁর অতি-অল্প। পাঠকের মুখ চেয়ে সস্তা ফরমায়েসী লেখা লিখুন তিনি, তা বলছি না, কিন্তু যারা তাঁর ভাবের ভাবুক,

---

বাংলাসাহিত্যে অনন্য। মাইকেল-রবীন্দ্রনাথের কিছু চিঠি আছে, ডায়রী নয়। চিঠি তবু দুজনের, ডায়রী একা লেখকের। পাশ্চাত্যের অনেক লেখকের ডায়রী রাখার অভ্যাস আছে। তাইতে তাঁদের রচনার প্রাথমিক আভাস ও অন্যান্য চিন্তা স্থান পেয়েছে। হেনরী জেমস, টমাস হার্ডি, ভার্জিনিয়া উলফ্ প্রভৃতির ডায়রী ও উপন্যাস পাশাপাশি পড়লে তাঁদের আন্তর সৃষ্টি-প্রক্রিয়া স্তর-পরম্পরা লক্ষ্য করা যায়। বিভূতিভূষণেও তাই। দ্রষ্টব্য ঃ

Henry James, The notebooks of Henry James; Thomas Hardy, The Early Years 1840-1891, The Later Years of Thomas Hardy, 1892-1928, Thomas Hardy's Notebooks; Virginia Woolf, A Writers Diary.

তাঁর রসের রসিক, তাদেরও ক্লান্তি আসতে পারে কোন সীমা অতিক্রম করলে, তা তিনি জানতেন না। নিজের মনের মধ্যে চোখ বুঁজে বসে স্মৃতি-অভিজ্ঞতার স্বাদটা রসিয়ে রসিয়ে স্বয়ং উপভোগ করাতেই তাঁর আনন্দ।

আর এই রসিয়ে স্বাদ গ্রহণের জন্যই তাঁর কাহিনীর গতি অতি মন্থর। ঢিমে তালে তাঁর চলন। এ যুগের অনেক উপন্যাসের চাল ধীর বিশ্লেষণে মন্থর—বিভূতিভূষণে ঠিক তা নয়। তাঁর চলন অপুর আড়বোয়ালের মাইনর স্কুলে যাতায়াতের মতন। ক্রোশ দুই পথ হাঁটিতে তার ক্লান্তি দূরের কথা, বরং আনন্দ হোতো। দুধের বট, তুঁতের ছায়া, ঝোপঝাপ মাঠ, মাঝে মাঝে অনেকখানি ফাঁকা আকাশ, আর কত অসংখ্য রকমের মানুষ। এই সব দেখাটাই প্রধান—পথ চলাটাই আনন্দ। আর ভাল ক'রে দেখতে গেলে থামতেও হয়—তাই অপু থামতে থামতে চলে। বিভূতিভূষণের চলাও থামার সঙ্গে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ। বিশ্লেষণ বা পরিণতির জন্যে তাঁর তাড়া নেই। পথের চেয়ে কী এমন বেশী পাওয়া যাবে গন্তব্য-প্রান্তে—এই তাঁর মনোভাব। অতএব পথটাকে দেখতে দেখতে চল, পথের চার ধারে অনেক মণিমুক্তো ছড়ানো আছে সেগুলো কুড়িয়ে নাও। বিভূতিভূষণের লেখনী তাই এক পা চলে, বেশ দু' দণ্ড দাঁড়ায়, তারপরে আবার এক পা চলে। যে যুগে লোকের ব্যস্ততা এরোপ্লেনের গতিকেই অপ্রচুর মনে করছে, সেই যুগের পক্ষে বিস্ময়কর লেখক সন্দেহ নেই। হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত নাগরিক ছটফটানি তো নয়ই, উপনাগরিক ডেলীপ্যাসেঞ্জারের ছোটাছুটিও তাঁর অপছন্দ, গ্রামীণ নিশ্চিন্ত ছুটির তালে তাঁর কলম বাঁধা।

বিভূতিভূষণের কাহিনী অত্যন্ত শিথিল-গ্রথিত। একটা ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার যোগ তেমন জৈবিক নয়, একটা থেকে আর একটা উদ্ভূত নয়, আলগা-আলগা ঘটনাগুলো হয়তো কোন চরিত্রের

(বেশীর ভাগ সময়ই নায়কের) মনের সূত্রে শিথিলভাবে গাঁথা। অনেক বই থেকে (যথা, পথের পাঁচালী) মধ্যের কয়েকটা পাতা তুলে নিলেও বইয়ের বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। অন্য লেখকের বইতে এমন করলে পাঠক ঐ মধ্যবর্তী শূন্যতায় হোঁচট খাবে। বিভূতিভূষণে তেমন হবার আশঙ্কা নেই। তাঁর বইয়ের দু'একটি দৃশ্যের সংস্থানে যদি ওলট-পালট করে দেওয়া হয়, অর্থাৎ আগের দৃশ্য পরে এবং পরের দৃশ্য আগে করে দেওয়া যায়, তাহলেও বিসদৃশ মনে হবে না। 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক' প্রভৃতি গ্রন্থে তো এ কথা খুবই সত্য। এটা হওয়ার কারণও রসাস্বাদী আত্মভাব মুগ্ধ বিভূতি-মানসে নিহিত। অন্যান্য ঔপন্যাসিক যখন নিজের কল্পনাকে প্লটের শাসনে বাঁধেন, তখন বিভূতিভূষণ রসাস্বাদনের আকাশে মুক্তি পেতে চান। প্লটের যৌক্তিক নিয়মশৃঙ্খলা মেনে, পরিমিতির মাপকাঠি মেপে ধাপে ধাপে কাহিনীকে গড়ে তুলবেন, বা তীক্ষ্ণাগ্র চূড়ান্তবিন্দুতে শেষ পর্যন্ত কাহিনীর ওজনটা চড়িয়ে মনকে বিপুলবেগে আকর্ষণ করবেন, এমন ধাত তাঁর ছিল না। ঘটনার নির্বাচনে ও সংস্থানে প্লটের দাবীর কথা তিনি বিশেষ মানতে চাইতেন না, নিজের ভাল-লাগা দৃশ্যের দাবী তাঁর মনের কাছে আগে। ঘটনা বাছাই ও সাজানোতে নাটকসুলভ পরিমিতি ও পারিপাট্য নেই তার। সুরের স্রোতে হাত-পা ছেড়ে ভেসে যাবার মন তাঁর। পা গুনে গুনে সংক্ষিপ্ততম লম্বপথে কোন অভীষ্টে তিনি পৌঁছতে চান না। কারণ, আগেই বলেছি অভীষ্ট তাঁর পথের শেষে নয়, পথের মধ্যে; গন্তব্যে নয়, গমনে। তাঁর কাহিনীতে ক্লাইম্যাক্স্ নামক বস্তুটা প্রায় নেইই বলা চলে; খুব ফ্ল্যাট ধরণে তিনি গল্প বলেন। তাঁর ঘটনার বিশেষ উত্থান-পতন নেই। একটা আপন-মনে-ভাবা অনুভূতিকে আপন-মনে-বলা ভাষায় তিনি প্রকাশ করতে চান। তাঁর সমধর্মী পাঠকও এই পদ্ধতিতে মাঝে মাঝে ক্লান্তি বোধ করতে বাধ্য।

॥ দুই ॥

॥ স্টাইল ॥

ষ্টাইলের রাজা প্রথম চৌধুরী বিভূতিভূষণের অল্প আগের লোক (১৮৬৮-১৯৪৬)। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই পর্বে তাঁর দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত। 'কল্লোল'-কালীন তিরিশের যুগের বহু লেখকের রচনা-শৈলীতে স্পষ্টভাবে অথবা সূক্ষ্মভাবে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব আছে। কিন্তু বিভূতিভূষণ যেমন ভাববস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেও স্বতন্ত্র, রচনাশৈলীর দিক থেকেও অপ্রভাবিত।

প্রথম বইতেই বিভূতিভূষণ তাঁর নিজস্ব ষ্টাইলের সেরা স্থানে পৌঁছে গিয়েছেন। তাঁর এই ষ্টাইলের বিশিষ্টতা তার সারল্যে, 'সাদা-মাটা'-ভাবে, স্নিগ্ধ মাধুর্যে, এবং স্মৃতিচারণের ঈষৎ-করুণ মধুর এক মেজাজে। এখানে তাঁর ব্যক্তি-আত্মার প্রতিফলন অতি স্পষ্ট। তাঁর সাহিত্য-জীবন ও ব্যক্তিজীবন এক বলেই এই প্রতিফলন এত নিখুঁত।

ষ্টাইলের জগতে প্রমথ চৌধুরী ও বিভূতিভূষণ দুই বিপরীত কোটির মানুষ। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে প্রতিতুলনায় বিভূতিভূষণের এই বিপরীত প্রকৃতি বোঝা আরও সহজ। প্রমথ চৌধুরী নাগরিকতা-পরিশীলিত, বিভূতিভূষণ গ্রামীণতা-পরিপালিত; একজনের ষ্টাইলে নিখুঁত কেতাদুরস্ত ভব্যতা আর একজন একবারেই কেতা-নিরস্ত। একজন কথায় এলোমেলো ভাবটা একেবারেই বরদাস্ত করেন না, কথাগুলিতে কড়া ইস্তিরির ক্রীজ চড়িয়ে তবে সভ্য সমাজে তিনি বেরোন; আর একজন কথাটায় কোনরকম পরিচ্ছন্নতা এলেই খুশী, শানানো ক্রীজের জন্য তাঁর মাথাব্যাথা নেই। প্রমথ চৌধুরী বহুপাঠী ও বুদ্ধিনিষ্ঠ,

বিভূতিভূষণ স্বল্পপাঠী ও অনুভূতিনিষ্ঠ। বাকচাতুর্যে প্রমথ চৌধুরীর জুড়ি মেলা ভার, বাকসারল্য বিভূতিভূষণের প্রধান অবলম্বন। অলঙ্কারে চৌধুরী মশায়ের প্রীতি আছে, সে-অলঙ্কার তাঁর ভার নয়, ধার। বিভূতিভূষণ নিরাভরণ, তরুলতা-ফুল-ফল যেমন মাটির স্বভাব-উক্তি, তেমনি স্বভাবোক্তি বিভূতিভূষণের একমাত্র অলঙ্কার ; সেটা কোন কোন সময় বোঝা হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু কোন সময়ই সবুজ স্বাভাবিকতা হারায় না। ঐ সবুজ আশ্রয়ে দু'দণ্ড জুড়োতে হ'লে যেতে হবে বিভূতিভূষণের কাছে, আর ভাষার অস্ত্রচালনার নৈপুণ্য দেখতে হলে যেতে হবে প্রমথ চৌধুরীর কাছে। চৌধুরী মশাই সূক্ষ্মাগ্র এপিগ্রাম ও প্যারাডক্সের খোঁচায় খোঁচায় পাঠকের মনকে এক দণ্ড স্বস্তি দেবেন না, আর বাঁড়ুজ্জ্যে মশাই দেবেন আঘাতের ওপর শীতল সান্ত্বনার প্রলেপ। প্রথম চৌধুরী রৌদ্র-দীপ্ত, বিভূতিভূষণ ছায়া-স্নিগ্ধ। একজনের কিশোর মন গড়ে দিয়েছে বাকবিদগ্ধ কৃষ্ণনগর, আর এক জনের সরল-বাক্ বনগ্রাম। গ্রামাঞ্চলে সবাই আত্মজন, সেখানে ভাষার পোষাকী রূপের দরকার হয় না, আটপৌরে রূপেরই চল ; আর নগরে বেশীর ভাগ সম্পর্কই 'ফর্ম্যাল', এবং সেইজন্য ভাষার পোষাকী রূপও অপরিহার্য।

সব চেয়ে বড় কথা দুজনের মন-মেজাজ। বিভূতিভূষণ যেন নিজের ভাবে বিভোর ; তিনি কথা বলেন নিজের কানে কানে। আর প্রমথ চৌধুরী পরের কান টেনে এনে তাকে দু' কথা শুনিয়ে দেন। প্রমথ চৌধুরীর একটা বড় দৃষ্টি সাহিত্য শিল্প ইত্যাদির ত্রুটির দিকে, তাই ঐ ফুটো-ফাটাকে মনে করে তাঁর ভাষার তীব্র আলোকরশ্মি-পাত ; বিভূতিভূষণের লক্ষ্য প্রধানত পূর্ণ সৌন্দর্যের দিকে, তাই তাঁর ভাষালোকের তীক্ষ্ণতা নেই, বরং আছে উপশমী (soothing) আভা। বাঁড়ুজ্যে মশাইর নজরটা ভাবের দিকে—তিনি ভাবুক ; চৌধুরী মশাইর একটা বড় নজর অভাবের দিকে—তিনি তাই বহু সময়ই চাবুক। সে-চাবুক

অবশ্য কোন কোন সময় মিষ্টি-মাখানো, তাতে ঝাল-মিষ্টি দুটোরই স্বাদ পাওয়া যায়। বিভূতিভূষণে ঝালের নামগন্ধও নেই। প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে একটি সমালোচক সদা-জাগ্রত ; সেই পাহারাদারের খবরদারী তাঁর গল্প-কবিতাতেও। সমালোচনার প্রধান পূর্বশর্ত সর্ববিষয়ে সম-লোচন, কিন্তু বিশেষ বিষয়ে বিভূতিভূষণের পক্ষপাতিত্ব সর্বজনবিদিত, সুতরাং সমালোচনাধর্মী লেখা তাঁর পক্ষে দুষ্কর। প্রমথ চৌধুরীর ধরণটা ইন্‌টেলেকচুয়াল, বিভূতিভূষণের ইমোশনাল।

॥ তিন ॥

॥ ভাষা ॥

ছেলেবেলায় পাঠশালায় অপু শ্রুতিলিখন লিখেছিলঃ 'এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ-গিরি। ইহার শিখরদেশ আকাশ-পথে সতত-সমীর-সঞ্চরমান-জলধর-পটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত—অধিত্যকা-প্রদেশ ঘন-সন্নিবিষ্ট বন-পাদপ-সমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে স্নিগ্ধ শীতল ও রমণীয়······পাদদেশে প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ-বিস্তার করিয়া······'

বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাসের' এই অংশ শোনবার সময় অল্পবয়স্ক অপুর অস্ফুট মনে যে প্রতিক্রিয়া জেগেছিল তা বিভূতিভূষণ লিপিবদ্ধ করেছেনঃ 'শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হইল অনেকগুলা অমন সুন্দর কথা এক-সঙ্গে পরপর সে কখনো শোনে নাই। ও সকল কথার অর্থ সে বুঝিতেছিল না। কিন্তু অজানা শব্দ ও ললিত পদের ধ্বনি, ঝংকার-জড়ানো এ অপরিচিত শব্দসঙ্গীত, অনভ্যস্ত শিশুকর্ণে অপূর্ব ঠেকিল···' (পথের পাঁচালী, পৃঃ ৬৫)।

অপুর এই প্রতিক্রিয়া থেকে বিভূতিভূষণেরও কোন ধরণের ভাষা তাঁর ভাল লাগে, তার পরিচয় পাওয়া যাবে। বিদ্যাসাগরের এই ভাষার 'ললিত পদের ধ্বনি' তাঁর মনে আবেদন জাগিয়েছিল। অথচ বিদ্যাসাগরের ভাষা শুধু 'ললিত' নয়, তার মধ্যে এক ধরণের দার্ঢ্য আছে, গাম্ভীর্য আছে। কিন্তু এ দিকটা বিভূতিভূষণের মনে বিশেষ সাড়া জাগায় নি। তিনি ছিলেন মাধুর্যের ভক্ত—মনুষ্য চরিত্রের ক্ষেত্রে, প্রকৃতির ক্ষেত্রে এবং ভাষার ক্ষেত্রেও। তাঁর ভাষার ঝোঁক লালিত্যের দিকে বেশী। এ ভাষা সহজে মনকে প্রসন্ন করে।

প্রথম জীবনে সাধুভাষা এবং শেষজীবনে চলিতভাষা ছিল তাঁর প্রধান আশ্রয়। কিন্তু তাতে তাঁর ভাষার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটে

নি, কারণ তাঁর মনের, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাষার মেজাজ পালটায় নি। এমন কি, অনেক পাঠক হয়তো খেয়ালই করে না যে তিনি সাধু থেকে চলিত ভাষায় গোত্র পালটেছেন। কারণ গোত্রান্তরিতের ক্রিয়াপদের রূপান্তর ঘটেছে, প্রাণধর্মের রূপান্তর ঘটে নি।

তাঁর ভাষার গুণগুলো দানা বাঁধে সেই সব যায়গায়, যেখানে তাঁর মন সব চেয়ে জেগে ওঠে। যথা, প্রকৃতি-সৌন্দর্য বর্ণনায়, স্মৃতিরোমন্থনে প্রভৃতি। অন্যত্র তাঁর সাদামাটা ভাষা এই উচ্চ মাধুর্যের পর্যায়ে থাকে না। থাকাটা সম্ভব নয়, কারণ জীবনের প্রতিটি প্রসঙ্গে মাধুর্যের সুযোগ নেই। আর এই সাদামাটা অংশগুলিতে লেখকের যেন আনন্দ কম; তিনি এই অংশগুলিকে সংযোগ-সূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন তাঁর অভীষ্ট প্রসঙ্গগুলিকে গেঁথে তোলবার জন্য। এই সূত্রগুলির বহু যায়গায় তাই লেখকের ক্লান্ত অনিচ্ছুক নিরানন্দ হাতের স্বাক্ষর আছে। বেশী লেখাও হয়তো এর একট কারণ। কিন্তু অভীষ্ট স্থানগুলিতে পোঁছলেই তাঁর কল্পনাশক্তি উদ্দীপ্ত হয়, সেই সানন্দ উদ্দীপ্তির আলো পড়ে তখনকার ভাষায়।

বিভূতিভূষণের ভাষার দোষ প্রধানত তিনটি। ক্লান্তিকর একটা একঘেয়েমি আছে তাঁর ভাষার। দ্বিতীয়ত, শব্দবিন্যাসের বিপর্যয় আছে দু' এক ক্ষেত্রে। তৃতীয়ত, ভাষার সংহতি কম। তিনটি ত্রুটিই পরস্পর-সংযুক্ত। তিনটিরই কারণ তাঁর আত্মপরায়ণ ভাবমুগ্ধতা, এবং সচেতনতা ও প্রযত্নের অভাব। কিন্তু এ ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁর লেখা একসঙ্গে অনেকখানি পাঠ না করলে, বা তাঁর পূর্বোল্লিখিত শ্রেষ্ঠ অংশগুলির সান্নিধ্যে এলে এক ধরণের ললিত সুরের প্রসন্নতার স্বাদ লাভ করা যায়। অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় বিভূতিভূষণের ভাষার দুর্বলতার কথা বলেও তিনটি গুণের কথা স্বীকার করেছেন। এক, 'স্বচ্ছ ও অনায়াস'। দুই, 'পাণ্ডিত্য-প্রকাশনী কোটেশন বা এলিউশনের অভাব।' তিন, 'দুর্লভ প্রসাদগুণ ও কবিত্বশক্তি'। (পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৩৯)।

॥ চার ॥

॥ স্মৃতিলোক ও চেতনাপ্রবাহ ॥

স্মৃতি-জগতে পদচারণা বিভূতিভূষণের অত্যন্ত প্রিয় কর্ম। বর্তমানের পথে রূঢ়তা ও রুক্ষতার কাঁটা বড় বেশী বাস্তব, তাকে ভোলা যায় না। অতীত স্মৃতির জগতে কাঁটাগুলোর কথা মনে পড়ে না মানুষের। বা পড়লেও তার ধার থাকে না, তখন সেই ভোঁতা কণ্টকাগ্রে হাত বুলিয়েও এক ধরণের আনন্দ আছে। নিজের মনের ভাল-লাগা সেখানে বাধাহীনভাবে মুক্তি পায়, বর্তমানের বাস্তবতায় খণ্ডিত হয় না। এমন কি বিস্মৃতির যবনিকাও সেখানে কোন বাধা নয়। সে যবনিকা অবলীলাক্রমে সানন্দ কল্পনায় এঁকে তোলা যায়। বস্তুত অতীতস্মৃতির জগৎ তো তাই-ই—খানিকটা কল্পনা ও খানিকটা ঘটনায় গড়া। 'বস্তুত তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।' (জীবনস্মৃতি, পৃঃ ১)।

বিভূতিভূষণ ডায়রী লিখতেন প্রধানত এই স্মৃতিরস পান করবার জন্য। এটা লেখবার সময় একবার নিকট-অতীতের কথা স্মরণ করতে হয়, তখন সেই স্মৃতিরসের আনন্দ তত ঘন নয়। কিন্তু সেই সঞ্চয় পরে কোন এক দিন ঘন স্মৃতিরসের আনন্দ-স্বাদ দান করবে। 'আমি এই সব তুচ্ছ খুঁটিনাটি লিখি এই জন্যেই যে, সবশুদ্ধ দিনটাকে ও তার আবহাওয়াটাকে অনেক দিন পরে আবার ফিরে পাওয়া যাবে। বড় আনন্দ হয়।' (স্মৃতির রেখা, পৃঃ ৪৬-৪৭)। এই ডায়রীর দিনগুলিকে স্মরণপথে আনলেই বিভূতিভূষণের কল্পনাশক্তি একটা মৃদু উত্তেজনা লাভ করত—সেটাকে তিনি রসিয়ে পান করতেন। এই পানপর্বই তাঁর গল্প-উপন্যাসের পর্ব। নিকটকে নিয়ে লিখতেন ডায়রী, সেই নিকটকেই একদিন দূরে ফেলে লিখতেন উপন্যাস বা গল্প।

সে-লেখা ডায়রীর যথাযথ পুনরুক্তি হোতো না, হোতো ডায়রীর কাঠামোর উপর কল্পনা-রচিত প্রতিমা। (আগেই বলেছি, 'স্মৃতির রেখা' ও 'আরণ্যক' মিলিয়ে পড়লে এর সত্যতা বোঝা যাবে।) এই জন্য তাঁর সব লেখাতেই স্মৃতি-রোমন্থনের একটা ভঙ্গি আছে, স্বাদও অনেকটা পূর্ববর্ণিত ঐ স্মৃতিরসের।

এই স্মৃতিলোকচারিতার ফলেই মাঝে মাঝে তাঁর উপন্যাসে চেতনা-প্রবাহ (Stream of Consciousness) বর্ণনার আভাস পাওয়া যায়। অবশ্য আবছা আভাসই মাত্র, জয়েস-প্রুস্ত-প্রমুখ লেখকদের মত এই আঙ্গিকের পরিণত স্তরে তিনি যান নি। মাত্র দু' একটি যায়গায় ঐ স্তরের রচনাভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়—যেখানে আভ্যন্তর পরাগতির (Inward Turning) চিহ্ন আছে। পাশ্চাত্ত্য সমালোচকরা এই আন্তরচারিতার মধ্যে mental prattle, association, revery, musing, building up প্রভৃতি যে সূক্ষ্ম ভাগ করেছেন, তার অনেকগুলিরই অস্ফুট স্বাক্ষর পাওয়া যাবে বিভূতিভূষণে। 'পথের পাঁচালী'র শেষ দিকে অপু নিশ্চিন্দিপুরে ফিরতে চায়, তখন তার চিন্তাপ্রবাহের বর্ণনা দিয়েছেন বিভূতিভূষণ এইভাবে ঃ

'আস্তাবলে দুই সহিসে ঝগড়া বাধাইয়াছে, রান্নাবাড়ীর ছাদে কাকের দল ভাতের লোভে দলে দলে জুটিতেছে—একটু পরে তাহার মনে হইল একই কি কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতেছে, একই কি কথা। আস্তাবলে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ থামে নাই···সে যেন মাটির ভিতর কোথায় সেঁধিয়া যাইতেছে···খুব, খুব মাটির ভিতর···নীচের দিকে যেন টানিতেছে বেশ আরাম···মাথা ধরা নাই বেশ আরাম।

'উঃ—কি রোদটাই ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে! দিদির যা কাণ্ড—এত রদ্দুরে চড়ুইভাতি! সে বলিতেছে—দিদি শুয়ে নে, এত রদ্দুরে চড়ুইভাতি?

'রাণুদি কানের কাছে বসিয়া কি সব কথা, অনেক কি সব কথা

বলিয়া যাইতেছে। রাণুদির ছলছলে ডাগর চোখ দুটি অভিমান-ভরা। সে কি করিবে? নিশ্চিন্দিপুরে তাদের চলে না যে? রাণুদি না লীলা?

'হারাণ কাকা বাঁশের বাঁশি বেচিবার জন্য আনিয়া বাজাইতেছে··· ভারী চমৎকার বাজায়! সে বাবাকে বলিল—এক পয়সার বাঁশের বাঁশি কিনবো বাবা, একটা পয়সা দেবে?

'তাহার বাবা তাহার বড় বড় চুল কানের পাশে তুলিয়া দিতে দিতে আদর করিয়া বলিতেছে—বেশ হয়েছে তোর গল্পটা, ছাপিয়ে এলে আমায় দেখতে দিস্ খোকা?

'সে বলিতেছে—কোকেন কি বাবা? গিরিশ সরকার বলেচে আমি নাকি কোকেন খাবো—

'বাবার গলায় পদ্মবীজের মালা। সেই কথক ঠাকুরের মত। তাহাদের মাঝেরপাড়ার ইষ্টিশান, কাঠের বড় তক্তায় লেখা আছে, মা-ঝে-র-পা-ড়া। সে আগে আগে, ভারী বোঁচকাটা পিঠে, মা পিছনে পিছনে। তাহার গায়ে রাঙ্গা পাঞ্জাবিটা, কেমন ছায়া সারাপথে। আকাশে সন্ধ্যাতারা উঠিয়াছে। পাকা বটফলের গন্ধে ভরা বাতাসটা।

'নিশ্চিন্দিপুরের পথ যেন ফুরাইতেছে না···সে চলিয়াছে··· চলিয়াছে···চলিয়াছে···সে আর মা···এ পথে একা কখনো আসে নাই, পথ সে চিনিতে পারিতেছে না···ও কাস্তে-হাতে কাকা, শুনচো, নিশ্চিন্দিপুরের পথটা এট্টু বলে দ্যাও না আমাদের। যশড়া-নিশ্চিন্দিপুর বেত্রবতীর ওপারে?' (পথের পাঁচালী, পৃঃ ২৩২)

দ্বিতীয় উদাহরণ নিচ্ছি 'অপরাজিত' থেকে। মৃত্যুর আগে সর্বজয়ার চিন্তাধারা ঃ

'জ্যোৎস্না অপূর্ব, ভয় হয় না···কেমন একটা আনন্দ···আকাশটা, পুরাতন আকাশটা যেন স্নেহে প্রেমে জ্যোৎস্না হইয়া গলিয়া ঝরিয়া বিন্দুতে বিন্দুতে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দিতেছে···টুপ···টুপ···টুপ-

টাপ···আবার কান্না পায়···জ্যোৎস্নার আলোয় জানালার গরাদ ধরিয়া হাসিমুখে ও কে দাঁড়াইয়া আছে?···সর্বজয়ার দৃষ্টি পাশের জানালার দিকে নিবদ্ধ হইল···বিস্ময়ে, আনন্দে রোগশীর্ণ মুখখানা মুহূর্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল···অপু···দাঁড়াইয়া আছে। এ অপু নয় সেই ছেলেবেলাকার ছোট্ট অপু···এতটুকু অপু···নিশ্চিন্দিপুরের বাঁশবনের ভিটেতে এমন কত চৈত্র জ্যোৎস্না-রাতে ভাঙ্গা জানালার ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িত যাহার দন্তহীন ফুলের কুঁড়ির মত কচি মুখে···সেই অপু···

'ও ছেলেমানুষ খঞ্জন পাখীর মত ডাগর ডাগর চোখের নীল চাহনি·· চুল কোঁকড়া কোঁকড়া মুখচোরা, ভাল মানুষ লাজুক বোকা···জগতের ঘোরপ্যাঁচ কিছুই একেবারে বোঝে না···কোথায় যেন সে যায়,···নীল আকাশ বাহিয়া বহুদূরে···বহুদূরের দিকে, সুনীল মেঘপদবীর অনেক উপরে···যায়···যায়···যায়···যায়···মেঘের ফাঁকে যাইতে যাইতে মিলাইয়া যায়।'···(অপরাজিত, পৃঃ ২৫৪-৫৫)।

প্রথম উদাহরণের ভাবনাধারাটি তন্দ্রাকালীন, দ্বিতীয়টির প্রাক-মৃত্যু মুহূর্তের। স্বাভাবিক অবস্থার মন বর্ণনায় প্রায় অসম্বদ্ধ, ইতস্তত-বিচরণশীল চেতনাধারার উল্লেখ বিভূতিভূষণ করেন নি। কাহিনীর বর্ণনায় তিনি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের বিপর্যয় ঘটান না। কাল-ক্রমের পারম্পর্য রক্ষায় তিনি উৎসাহী; সকল কালকে ভেঙ্গে চুরে একটা চেতনার মণ্ড বানাতে চান না তিনি। এ ক্ষেত্রে বিভূতি-ভূষণ গতানুগতিক ভঙ্গীর অনুসারী। পাশ্চাত্যের একাধিক আধুনিক স্মৃতিচারী লেখক কালক্রমের ব্যত্যয় ঘটিয়ে যে নূতন পরীক্ষা করেছেন, স্মৃতিপ্রীতি সত্ত্বেও বিভূতিভূষণ সে দলের নন।

'স্মৃতির এক কাজ সময়ের গতিকে স্তম্ভিত করিয়া কালপ্রবাহকে বিপরীত মুখে চালানো। প্রখর স্মৃতির সাহায্যে বর্তমানের কঠিন নিগড় হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, অতীত বর্তমান অপেক্ষাও সজীব

হইয়া উঠে। এই স্মৃতিলীলার ফলে বিভূতিবাবুর উপন্যাসে বর্তমান হইতে অতীতে ও অতীত হইতে বর্তমানে নিয়ত যাতায়াত চলে। হঠাৎ প্রুস্ত্-এর 'হারানো কালের অনুধাবনের' কথা মনে পড়িয়া যায়। পরক্ষণেই ধরা পড়ে এ তুলনা কপট তুলনা। কথাশিল্পে কালবোধের প্রয়োগে বিভূতিবাবু সনাতন পন্থী; অপুর জীবনকাহিনীতে সময়ের ক্রম সহজেই অনুসরণ করা যায়, ঘটনার পারম্পর্যের শৃঙ্খল অটুট থাকে বলিয়া। প্রুস্ত্ একেবারে বিপ্লবপন্থী। তাঁহার কালক্রম বৈজ্ঞানিকের ক্রনোমিটারে ধরা পড়িবার নয়। তাহা একেবারে স্বসিদ্ধ, স্বেতর কোন শাসনের বশীভূত নয়।...

'প্রুস্ত্ বর্ণিত কাল স্থিতিস্থাপকশীল, তাহার আপেক্ষিকতা বহির্বর্তী মানদণ্ডের অতীত। এ কথায় সকলেই সায় দিবেন যে প্রুস্তের মধ্যে তারিখ বা যুগসম্বন্ধে কখনো কোন সুনিশ্চিত নির্দেশ থাকে না। তাঁহার উপন্যাসে কাল গণনা মাস বা বৎসরের অনুপাতে হয় না, হয় কেবল আত্মার ঋতুপরিবর্তন অনুসারে। কালের সেই বঙ্কিম প্রবাহ এতই অনিয়ন্ত্রিত যে তাহাকে অঙ্কে বাঁধা অসাধ্য। সেখানে পরিবেষ্টনের সামান্য বিকারই বিশ্বসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট, এবং সেই বিবর্তনেই পাঠক সঞ্জিবিত হইয়া উঠে; সেখানে দেশ ও কাল স্মরণের উপকরণ মাত্র, আসলে উহাদের পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতই অভীষ্ট বস্তু।' (নীরেন্দ্রনাথ রায়, অপরাজিত, পরিচয় শ্রাবণ, ১৩৩৯)